অশরীরী

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী



পি, কে, বোস য়্যাণ্ড কোং
কলিকাতা ৩১

—আড়াইটাকা—

প্রচ্ছদ পট—শ্রীদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পি, কে, বোস য়্যাণ্ড কোং, ঢাকুরিয়া—কলিকাতা ৩১, হইতে প্রফুল্লকুমার বসু ক
প্রকাশিত ও শ্রীকালী প্রেস, ৬৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীপরমা
সিংহ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্রীঅলক গুপ্ত

করকমলে—

এই লেখকের অন্যান্য বই

রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ ১, ২
রবীন্দ্র কাব্যনির্ঝর
রবীন্দ্র নাট্য-প্রবাহ
রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন
মাইকেল মধুসূদন
বাংলার লেখক

জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার
অশ্বত্থের অভিশাপ
চলন বিল
কোপবতী
পদ্মা
দেশের শত্রু

ঋণং কৃত্বা
সানি ভিলা (ঘৃতং পিবেৎ)
মৌচাকে ঢিল
ডিনামাইট
পরিহাস বিজল্পিতম্
গভর্ণমেণ্ট ইন্সপেক্টর
পারমিট

বাঙ্গালী ও বাংলা-সাহিত্য
বাঙালীর জীবন-সন্ধ্যা
চিত্র-চরিত্র

বিদ্যাসুন্দর
প্রাচীন গীতিকা হইতে
অকুন্তলা
প্রাচীন আসামী হইতে
দেয়ালি
বসন্তসেনা
আত্মঘাতিনী
যুক্তবেণী

শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব্ব
শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব্ব
গালি ও গল্প
গল্পের মতো
ডাকিনী
ব্রহ্মার হাসি
'প্র-না-বি'র নিকৃষ্ট (?) গল্প

অশরীরী

অল্প দিনের মধ্যে পর পর কয়েকটি মৃত্যুতে আমাদের বাড়ীতে একটি অনৈসর্গিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল।

প্রথমে মারা গেল বাড়ীর একটী ছোট ছেলে, খেলা করিবার সময় ছাদ হইতে পড়িয়া। সেই ঘটনায় বালকের মাতা এমন অভিভূত হইয়া পড়িল যে, সে শয্যাগ্রহণ করিল। সেই শয্যা আর সে ছাড়িল না। মৃত্যু আসিয়া শোকাতুরার সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিল। এই দুটি মৃত্যুর মধ্যে দেড় মাস কালেরও ব্যবধান নয়। তৃতীয় মৃত্যুটি আরও আকস্মিক। তখন বর্ষাকাল। বিদ্যুতের তারে কোথায় কি ত্রুটি হইয়াছিল, কেহ জানিত না। বাড়ীর একটি বয়স্ক বালক সুইচ টিপিতে গিয়া প্রাণ হারাইল। সেই ঘরটিতে অপর কেহ ছিলনা, কেহ তাহাকে সাহায্য করিবার অবকাশও পাইল না। চতুর্থ বা শেষ মৃত্যুটি ঘটিল বাড়ীর একটি চাকরের। অনেক দিনের পুরানো চাকর, আমাদের পরিবারের স্বাঙ্গীভূতপ্রায় হইয়া গিয়াছে। রাতের বেলায় সুস্থ শরীরে সে শুইয়াছিল, ভোরবেলায় দেখা গেল তাহার দেহ প্রাণহীন। ডাক্তার আসিল, পরীক্ষা করিয়া বলিল, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। আমরা বলিলাম, লোকটির তো হার্টফেল করিয়া মরিবার বয়স হয় নাই। ডাক্তার বলিল, আর সবেরই বয়স আছে, মরিবার বয়স নাই। অভিজ্ঞ ডাক্তার ছাড়া এমন আর কে বলিতে পারিত।

তিন চার মাসের মধ্যে এই চারিটি মৃত্যু বাড়ীতে ঘটিল। পরিবারের বালকবালিকা হইতে বয়স্কগণ অবধি সকলেই ভাঙিয়া পড়িল

কিন্তু শোক যতই তীব্র ও ব্যাপক হোক না কেন সংসার তাহার প্রাত্যহিক দাবী ছাড়ে না, সেই দাবী মিটাইবার জন্য আমাকে বাধ্য হইয়া শক্ত থাকিতে হইল। শোক করিবার অবকাশ আমার ছিল না।

সংসারে প্রাত্যহিক কাজকর্ম্ম নিতান্ত অভ্যাসের তাগিদেই আপনার চিহ্নিত পথে চলিতে লাগিল। সকাল হয়, চাকর বাজারে যায়, যথাসময়ে আহারের ডাক পড়ে, অফিসগামীরা অফিসে যায়, এইভাবে সবই চলিতেছে, কিন্তু কাহারও মনে আনন্দ নাই, জীবনে উৎসাহ নাই, এমন কি সবাই যেন স্বল্পভাষী হইয়া পড়িয়াছে। কেহ অপরের মুখের দিকে ভালো করিয়া তাকাইতে সাহস করে না, কি জানি দুই দৃষ্টির ঠোকাঠুকিতে সুপ্ত শোকের আগুন যদি জ্বলিয়া ওঠে।

আরও একটা ভীষণতর সম্ভাবনা ছিল। 'এবার কার পালা?' এই আশঙ্কা প্রত্যেকের মনেই গুপ্ত ছিল—হঠাৎ যদি চোখে চোখে ঠেকিয়া কথাটা প্রশ্নরূপে ঝলকিয়া ওঠে, তাই সকলে পরস্পরের চোখ এড়াইয়া চলিত। আর এতবড় বাড়ীটা কেমন যেন অদ্ভুত রকম নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল! লোকে যে কথাবার্ত্তা বলিত না, কিম্বা বিশেষ করিয়া ধীরপদেই চলিত এমন বলি না--কিন্তু কণ্ঠস্বর ও পদশব্দ মনে হইত যেন অনেকটা দূর হইতে আসিতেছে, মনে হইত সিঁড়ির উপরে কে যেন অদৃশ্য গদি পাতিয়া রাখিয়াছে—নতুবা ওঠানামার শব্দ এত ক্ষীণ কেন?

এই সময়ে একদিন একজন পশ্চিমা চাকর নিযুক্ত হইল। হঠাৎ রাত্রিবেলা তাহার আর্ত্তস্বর শুনিয়া সকলে নিচের তলায় ছুটিয়া গেলাম, কি ব্যাপার! দেখিলাম যে লোকটা জাগিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। 'কি হয়েছে রে?' সে কেবল একটি কথা বলিল,

"দেও"। এই বলিয়া সে জানালার বাহিরের কালো বকুল গাছটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। দেখিলাম যে, বাহিরের দিকে অন্ধকারের মধ্যে বকুল গাছটা একটা সুবৃহৎ তোড়া-বাঁধা অন্ধকারের মতো দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে 'দেও' অর্থাৎ ভূতটুত কিছু নয়, হঠাৎ ওই গাছটা দেখিয়া ভয় পাইয়া গিয়াছে। সে বুঝিতে চায় না। সে বলে 'দেও' একটা নয়, দুইটা। একটা লেড়কা, আর একটা আওরৎ জানলার দিকে মুখ করিয়া ওই গাছটার তলায় দাঁড়াইয়াছিল।

আমি বলিলাম—তাহারা 'দেও' নয়, সত্যকার মানুষ।

সে মানিবে কেন? পাছে আরও কিছু বলিয়া ফেলে, তাই প্রসঙ্গ চাপা দিয়া তাহাকে উপরতলায় লইয়া গিয়া আমার ঘরের বারান্দায় শুইতে বলিলাম। ভোরবেলা উঠিয়া সে একটা পশ্চিমা ধরণের সেলাম করিয়া বিদায় হইয়া গেল, বলিল যে, এ বাড়ীতে 'দেও' আছে।

এই ঘটনায় সকলের মনের শোকের সহিত ভয়ের যোগ হইল। আমি সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করি যে, বেটার পালাইবার ইচ্ছা ছিল, তাই ভূতের একটা অবতারণা করিল। কিন্তু মুস্কিল এই যে, কেহ আমার সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক অবধি করে না, করিলে আমার যুক্তির স্বপক্ষে দু-চার কথা বলিবার অবকাশ পাইতাম। আমার কথা শুনিয়া সকলে চুপ করিয়া থাকে, বেশ বুঝিতে পারি, সকলেই মনের ভিতরে শোক ও ভয়কে এক শয্যায় সযত্নে লালন করিতেছে। আমি বুঝিলাম, সকলের মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ হইবার মুখে, অতঃপর দৈহিক স্বাস্থ্যও ভাঙিয়া পড়িবে। তখন আমি একদিন প্রস্তাব করিলাম

যে, কিছুদিনের জন্য সকলে একবার শিমুলতলা ঘুরিয়া আসিলে কেমন হয়। কেহ উৎসাহ প্রকাশ না করিলেও আপত্তি করিল না। শিমুলতলায় আমাদের একটি বাড়ী ছিল। কয়েকদিন পরে আমি সকলকে লইয়া গিয়া শিমুলতলায় রাখিয়া আসিলাম। কলিকাতার বাড়ীতে আমি একা থাকিলাম, আর থাকিল একটা নূতন চাকর। সে পূর্ব্বেতিহাসের কিছুই জানিত না।

শিমুলতলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি অসুখে পড়িলাম। অসুখ এমন কিছু নয়, প্রথমটা কিছুদিন সর্দ্দিজ্বর বা ইনফ্লুয়েঞ্জা বলিয়া চালাইলাম। কিন্তু আট দশ দিন পরেও শয্যাত্যাগ করিতে সমর্থ না হইলে ডাক্তরকে কল দিলাম।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, কোন বিশেষ রোগের লক্ষণ মিলিতেছে না, 'নার্ভাসশক' বলিয়া মনে হইতেছে। "নার্ভাসশক" ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, দেহের স্নায়ু-পুঞ্জের উপর দিয়া অনেক ঝড়ঝাপটা গিয়াছে, তাই তাহারা সাময়িকভাবে বিকল হইবার লক্ষণ দেখাইতেছে। তারপরে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, কোন ভয় নাই—কিছুদিন শুইয়া থাকুন, সব সারিয়া যাইবে। ডাক্তার বিদায় হইলে ভাবিলাম, ডাক্তারের কথা মিথ্যা নয়—এ কয়মাস আমাকে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে। মৃত্যুশোকে আর সকলে যখন কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, আমার বিশ্রামের সময় ছিল না, এমন কি একটু নিরিবিলি বসিয়া একবার যে অশ্রুপাত করিব, সে অবসরটুকুও পাই নাই। বুঝিলাম যে, ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষোভ জমিয়া উঠিতেছিল, তখন প্রকাশের সময় ছিল না, এখন অবসর পাইয়া স্নায়ুপুঞ্জ এলাইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তারে বলিয়াছে, কোন ঔষধের প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ

এ রোগের কোন ঔষধ নাই, শুইয়া থাকাই একমাত্র চিকিৎসা, তাই শুইয়া থাকিলাম, অবশ্য উঠিবার শক্তি ছিল না—ইচ্ছাও বড় ছিল না।

সারাদিন একাকী শুইয়া থাকি, সারাদিন এবং সারারাত। চাকরটা নিয়মিত সময়ে আসিয়া খাদ্য ও পথ্য দিয়া যায়, অন্য সময়ে তাহার বড় দেখা পাই না, তবে পদশব্দে ও গার্হস্থ্য কাজের টুকটাক আওয়াজে বুঝিতে পারি যে, লোকটা নিচের তলাতেই আছে। আমাদের বাড়ীটা নিতান্ত ছোট নয়, তিনতলা, চকমিলানো ধরণের সেকেলে বাড়ী। ক্ষুদ্র বৃহৎ মাঝারি অনেকগুলি কক্ষ বাড়ীটিতে; এখন দু'তিনটি ছাড়া সব তালাবন্ধ, সকলে থাকিবার সময়েও সবগুলি খুলিবার প্রয়োজন হয় না।

দোতলার একটি প্রশস্ত কক্ষে এক দিকে আমার শয্যা, শুইয়া থাকিলে বাহিরের পথের লোক চলাচলের কতক চোখে পড়ে, রাত্রি-বেলায় গ্যাসের আলোক কতক ঘরে আসিয়া ঢোকে আর বসন্ত ও বর্ষাকালে যথাক্রমে দক্ষিণ ও পূবের জানালা দিয়া হু হু করিয়া বাতাস প্রবেশ করে। আমি অনেকগুলি বালিশ মাথায় দিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া পড়িয়া থাকি; ক্লান্তি যতই বাড়ে—একটি করিয়া বালিশ সরাইয়া ফেলি, শেষ একটি বালিশ যখন অবশিষ্ট থাকে, তখন বিছানার উপর গড়াইতে থাকি,—গড়াইতে গড়াইতে কখন ঘুমাইয়া পড়ি। এইভাবে রাত্রি কাটিয়া যায়। আর দিন? দিনের বেলায় জাগিয়া ভাবিয়া এবং লঘুধরণের বই পড়িতে চেষ্টা করিয়া কাটাই, পথের আনাগোনা দেখি আর জানালা দিয়া বকুল গাছটার পাতায় আলোর চিকিমিকি দেখি ও পাখিগুলার কিচিমিচি শুনি। মাঝে মাঝে চাকরটা আসিয়া পথ্য খাদ্য ও ডাকের চিঠি দিয়া যায়।

অশরীরী

সেদিনটার কথা, কিম্বা আরও সঠিকভাবে বলা উচিত—সে রাতটার কথা কখনও কি ভুলিতে পারিব! আজ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছি বলিয়া সকল কথাই বলিতে পারিতেছি। সে দিনের অভিজ্ঞতাকে এখন অপরের অভিজ্ঞতা বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু কখনও ভাবি নাই "তাহার" হাত হইতে মুক্তি পাইব। অনেকে আমার অভিজ্ঞতা শুনিয়া বলিয়াছে, ওটা "নার্ভাস শকের" প্রতিক্রিয়া, আসলে কিছুই নয়।

নার্ভাস শক। ডাক্তার এই যে কথাটা বলিয়াছিল লোকে তাহার বেশী তার অগ্রসর হইতে চায় না। কিন্তু আমিতো জানি, আমার অভিজ্ঞতায়, "তাহার প্রভাব" কতখানি সত্য,—কত মর্ম্মান্তিকভাবে সত্য। লোকে যখন 'নার্ভাস শক' বলিয়া ব্যাপারটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে, আমি তর্ক করি না, চুপ করিয়া থাকি কিম্বা বড় দুঃখে হাসি আর ভাবি—একজনের অভিজ্ঞতা অপর একজনকে বুঝানো কত কষ্ট।

সেই প্রথম রাত্রির অভিজ্ঞতাকে "তাহার আবির্ভাবের" সূত্রপাত বলিয়া তখন বুঝিতে পারি নাই, আদ্যন্ত ইতিহাস মিলাইয়া লইয়া আজ বুঝিতেছি এবং তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার পরেও শিহরিয়া উঠিতেছি, ভাবিতেছি—মৃত্যুর কত নিকটেই না গিয়াই পড়িয়াছিলাম!

সেদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গিয়া জানালার দিকে নজর পড়িবামাত্র বুকের রক্ত একবারের জন্য ছাঁৎ করিয়া উঠিয়া যেন জমিয়া কঠিন হইয়া গেল। দেখিলাম জানলার ঠিক বাহিরেই অতিকায় একটি মস্তক। ভাবিলাম, স্বপ্ন দেখিতেছি, কিন্তু চোখে হাত দিয়া বুঝিলাম চোখের পাতা খোলা, গায়ে চিমটি কাটিয়া দেখিলাম—লাগিতেছে। সন্দেহ মাত্র আর রহিল না যে, আমি জাগ্রত। ভয়ে

চীৎকার করিতে চেষ্টা করিলাম—স্বর বাহির হইল না; ঘরের আলো জ্বালিবার ইচ্ছা হইল—কিন্তু উঠিতে পারিলাম না—এ যেন অপরের শরীর! কালো প্রকাণ্ড মস্তক! নাক চোখ মুখগুলা দেখা-যাইতেছে না বটে, কিন্তু মস্তক যে তাহাতে সন্দেহ নাই। ওদিকে চাহিয়া থাকা কঠিন, না থাক, আরও কঠিন। সেই শীতের রাত্রে কপালে ঘাম গড়াইতে লাগিল। এই অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যখন বন্ধ হইবার মুখে—ঠিক সেই সময়ে একখানা মোটর গাড়ী পথ দিয়া চলিয়া গেল। তাহার বাতি হইতে এক ঝলক আলো মুণ্ডটার উপরে পড়িল। মুণ্ড কোথায়? সেই ঝাঁকড়া বকুলগাছটা যে! আবার বুকের রক্ত ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া নিয়মিত হইল! মনে মনে হাসিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তখনই মনে পড়িল যে, এ কেমন ভ্রান্তি। যে বকুল গাছটাকে অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর দেখিতেছি, তাহাকে কেন হঠাৎ অতিকায় মস্তক বলিয়া মনে হইল! তখনই আবার ডাক্তারের কথা মনে পড়িল,—নার্ভাস শক। পুস্তকে পড়িয়াছি বটে যে, নার্ভাস শকের ফলে কত সম্ভব বস্তুকে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়! যাই হোক গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, জল খাইবার জন্য উঠিলাম। টেবিলের উপরে এক গ্লাস জল ঢাকা থাকে। ঢাকা খুলিয়া দেখিলাম গেলাস শূন্য। জল খাইল কে? আমিই কি আগে আর একবার উঠিয়া জল পান করিয়াছি? কই, মনে তো পড়ে না! চাকরটার উপরে রাগ হইল, ব্যাটা ফাঁকি দিতে সুরু করিয়াছে। জল পান আর হইল না, ঘরে আর জল ছিল না। শুইয়া পড়িলাম এবং ঘুম আসিতে বিলম্ব হইল না।

আমার অভিজ্ঞতা শুনিয়া অনেকে শুধাইয়াছে—কিছু দেখিয়াছ কি? স্বীকার করিতে হয় যে, কিছু বা কাহাকেও দেখি নাই। লোকে

হাসে, তাহাদের নার্ভাস শকের থিওরীটা আরও পাকা হয়! কিন্তু তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছি, কিছু না দেখার চেয়ে কিছু দেখা অনেক ভালো। শরীরীর সহিত বোঝাপড়া চলে—কিন্তু অশরীরীর সহিত তেমন হইবার নয় বলিয়াই তাহা ভয়ঙ্কর। এখন হইতে আমার অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়, শত্রুকে 'অশরীরী' বলিয়া উল্লেখ করিব।

পরদিন রাত্রে আবার ঘুম ভাঙিয়া গেল—দেয়াল-ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলাম রাত্রি দেড়টা। তখনই বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, সেই কালো মাথাটা নাই তো? আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম বকুলগাছটার পাতাগুলি বাতাসে কাঁপিতেছে। স্বস্তি বোধ করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভীরুতার প্রতি এক প্রকার ধিক্কার বোধ হইল। তৃষ্ণা পাইয়াছিল—জল পান করিবার জন্য উঠিলাম, গেলাসের ঢাকনা তুলিয়া দেখিলাম গেলাস শূন্য। কাল বকুলগাছটাকে কালো মাথা কল্পনা করিবার ফলে মনে হইয়াছিল যে, অশরীরী জল পান করিয়া গিয়াছে। আজ ভয়ের সেই পরিপ্রেক্ষিত ছিল না, মনে হইল চাকরটাই ফাঁকি দিয়াছে। শাসন করিয়া দিবার অজুহাতে (আসল কথা নিজের ভয়টাকে অন্তঃসারশূন্য প্রমাণ করিবার আশায়) অত রাত্রেই ডাকাডাকি করিয়া চাকরটাকে জাগাইলাম। সে আসিয়া শপথ করিয়া বলিল যে, গেলাসে জল দিয়া একটা পিরিচ দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া গিয়াছে। আমি যখন জল খাইতে যাই, তখন সেই গেলাস পিরিচে ঢাকাই ছিল বটে। আমার ভুল হইয়াছে স্বীকার করিয়া তাহাকে বিদায় দিলাম। বিছানায় আসিয়া শুইলাম, কিন্তু চিন্তা নূতন সূত্র অবলম্বন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল! জল খাইল কে? আমিই ঘুমের ঘোরে উঠিয়া জল পান করিয়াছি—এমন

অসম্ভব না হইলেও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সম্ভব মনে হইল না। ঘুমাইয়া পড়িবার আগে সঙ্কল্প করিলাম—কাল হইতে ঘুমাইবার আগে প্রচুর জল পান করিয়া লইব, যাহাতে মাঝ রাতে জাগিয়া উঠিয়া এরূপ অদ্ভুত সমস্যায় না পড়িতে হয়।

দিনের বেলা আর পাঁচটা চিন্তায় এসব বিষয় মনে পড়িত না। কিম্বা মনে পড়িলেও হাস্যকরভাবে তুচ্ছ বোধ হইত। রাতে শুইবার আগে প্রচুর জল খাইয়া লইলাম। রাতে আর জাগিতে হইল না। ভোরবেলা চাকরে চা আনিল। আগের দিন তাড়া খাইয়াছিল—আজ ঘরে ঢুকিয়াই গেলাসটার দিকে তাকাইল, আমিও তাকাইলাম—গেলাস খালি। যে পিরিচখানা দিয়া সে জল ঢাকিত, সেখানা পাশে পড়িয়া আছে, গেলাস একখানা বই দিয়া ঢাকা। বইখানা দূর হইতে দেখিয়াই বুঝিলাম—Poe-র Mystery and Imagination-এর গল্প। চমকিয়া উঠিলাম—এই বই তো নীচের লাইব্রেরী ঘরে ছিল—এখানে আনিল কে? আর গেলাসই বা খালি করিল কে? চাকরকে আর কি বলিব? নিজের চিন্তাসূত্রে কেবল নিজেই জড়িত হইতে লাগিলাম।

ক্রমে আমার প্রত্যয় জন্মিল যে, রাতের বেলায় কেহ আমার ঘরে ঢোকে। প্রকৃতিস্থ থাকিলে সহজেই বুঝিতে পারিতাম—এমন হওয়া সম্ভব নয়, কারণ আমি স্বহস্তে ঘরের দরজা বন্ধ করি এবং ভোর-বেলা উঠিয়া স্বহস্তে বন্ধ দরজা খুলি। কিন্তু এসব বিষয় বুঝিবার মতো আমার মনের অবস্থা ছিল না। আমার একটি পিস্তল ছিল, বাক্সের মধ্যে থাকিত, এতদিন পরে সেটা বাহির করিয়া বালিশের তলায় রাখিলাম।

অশরীরী

একবার মনে হইত নির্জ্জন বাড়ীর নিঃসঙ্গতা পরিহার করিয়া লোকজনের সঙ্গে মিশিলে হয়তো অশরীরীর' হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু শরীর এত দুর্ব্বল যে, অন্যত্র যাইবার শক্তি ছিল না। তা ছাড়া আমি মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলাম না বলিয়া আমার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা স্বল্প। যে কয়েকজন আছে, সবাই কাজের লোক, কে আসিয়া সারাদিন আমার সঙ্গে গল্প করিবে? কাজেই সারাদিন একাকী থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ক্রমে অশরীরীর প্রভাব দিনের বেলাতেও অনুভব করিতে আরম্ভ করিলাম। মনে হইত, পাশের ঘরে কে যেন ফিস্‌ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছে—কিম্বা খুব মৃদু পদসঞ্চারে চলাফেরা করিতেছে। নিশ্চয় জানিতাম কেহ নাই, তবু একবার দেখিয়া আসিতাম। রেলের এঞ্জিন বাষ্প ছাড়িলে যেমন একপ্রকার ঝঞ্ঝনা শব্দ হয়, কানের ভিতর সেই রকম শব্দ শুনিতে পাইতাম। আরও একটা ব্যাপার। মনে হইল সহসা আমার শ্রবণ শক্তি যেন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। স্বরগ্রামের মাঝখানের অংশটুকুই সাধারণ কর্ণ ধরিতে পারে, খুব নীচু বা খুব উঁচুর দিক শুনিতে পায় না। আমার শ্রবণশক্তির সীমানা যেন অনন্তবিস্তৃত হইয়াছে। আমি যেন কলিকাতার বাড়ীটিতে বসিয়াই পাড়ার দূরবর্ত্তী বাড়ীগুলিতে কে কি বলিতেছে তাহারও অনেক কথা শুনিতাম। একদিন শিমুলতলার পত্র পাইলাম। তাহারা লিখিয়াছে যে, সকলে একদিন ডাকবাংলায় আশ্রয় লইয়া খিচুড়ি রাঁধিয়া খাইয়া আসিয়াছে। উত্তরে লিখিলাম যে, এ ঘটনা আমার অগোচর নয়। আরও লিখিলাম যে, ডাকবাংলার হাতার মধ্যে একটা গাছের উপরে ঘুঘু ডাকিতেছিল, তোমরা শুনিয়াছিলে কি? সকলে আমার উত্তরকে কবিত্ব মনে করিয়া লিখিল,

অশরীরী

ঘুঘুর ডাক যদি স্বকর্ণে শুনিতে চাও, তবে এখানে চলিয়া এসো না কেন ?

ঘুঘুর ডাক শুনিবার জন্য নয়, সে তো কলিকাতায় বসিয়াই আমি শুনিতে পারি, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে গিয়া পড়িলে অশরীরীর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে, এই আশায় চাকরের উপর বাড়ী জিম্মা রাখিয়া আমি শিমুলতলায় রওনা হইয়া গেলাম। সকলে আমার শরীরের অবস্থা দেখিয়া বলিয়া উঠিল—এ কী, দুই মাসে যে ছয় মাসের রোগী বনিয়া গিয়াছ—ব্যাপার কি ?

কেহ বলিল—শরীর অর্দ্ধেক হইয়াছে।

কেহ বলিল—মুখ ফ্যাকাসে হইয়াছে।

কেহ বলিল—কতকাল চুল কাটো নাই।

কেহ বা বলিল—কেবল চোখ দুইটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।

সকলে সমস্বরে বলিল—এখানে কিছুদিন থাকো, সব সারিয়া যাইবে।

শিমূলতলায় একটা পাহাড়ের চূড়ায় আমাদের বাড়ী। বাড়ীর বারান্দায় বসিলে মনে হয়, থিয়েটারের গ্যালারীর উচ্চতম সীটে উপবিষ্ট—সম্মুখে পাহাড় গড়াইয়া নামিয়াছে, গায়ে গায়ে ছোট বড় বাড়ী, বাগানে বাগানে শীতের মরসুমি ফুল। নিম্নে উপত্যকা, ধানের মাঠ, তখন ধানকাটা হইয়া গিয়াছে, এক দিকে শীর্ণ নদী, এখানে ওখানে দেহাতি লোকের ছোট ছোট গ্রাম, উপত্যকার শেষে বন, বনের মাথার উপর দিয়া দিগন্ত ঘেরিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়—মাথায় শাল ও বাঁশের ঘন বন। সারাদিন বারান্দায় বসিয়া থিয়েটারের দর্শকের মতো এই দৃশ্য দেখিতাম! এই নিস্তব্ধতার মধ্যে মূর্ত্তিমান চঞ্চলতার

মতো রেলগাড়ী মাঝে মাঝে বেগে চলিয়া যাইত—গাছের ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইতাম।—এখানে আসিয়া আর একটি আবিষ্কার করিলাম। একদিন সকালে আমরা তিনজনে দুর পাল্লায় ভ্রমণে বাহির হইলাম। অনেক দূর গিয়া চায়ের তৃষ্ণা পাইল। একটা থলিতে ষ্টোভ, চা, চিনি, কেটলি প্রভৃতি ছিল। কেবল দুধের অভাব। মাঠের মধ্যে দুধ পাইবার আশা নাই দেখিয়া যখন নিবৃত্ত হইতে যাইতেছি, আমি বলিয়া উঠিলাম—ওই দেখো, দূরে মাঠের মধ্যে গোটা কয়েক গরু ও রাখাল দেখা যাইতেছে—ওখানে গেলে দুধ মিলিতে পারে।

সকলে ভালো করিয়া দেখিল—কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না।

আমি বলিলাম—তোমরা কেন দেখিতে পাইতেছ না? ওই তো স্পষ্ট!

তাহারা বলিল—চায়ের তৃষ্ণায় মরিতেছি, এখন ঠাট্টা ভালো লাগে না

আর একজন বলিল—লোকে মাঠের মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকা, দেখে, তুমি যে 'গো-তৃষ্ণিকা' দেখিতে লাগিলে!

তৃতীয়জন বলিল—তুমি কি চোখে দূরবীণ লাগাইয়াছ নাকি।

আমি বলিলাম—অবিশ্বাসে কাজ কি? আমাদের তো যাইতেই হইবে—চলো ওই দিকেই যাই না!

সকলে নির্দিষ্ট দিকে চলিলাম—প্রায় এক ক্রোশ পথ চলিবার পরে সত্যই সকলে সেই গরুর পাল দেখিতে পাইল!

আমার সঙ্গীদের একজন বলিল—কী আশ্চর্য! তুমি এক ক্রোশ দুর হইতে দেখিলে কিরূপে? তাই তোমার চোখ এমন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল!

আর একজন বলিল—আন্দাজে ঢিল লাগিয়াছে! মাঠে গরু চরবে এ আর বিচিত্র কি!

আর একজন বলিল—এমন অস্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি কিন্তু ভালো লক্ষণ নয়!

সেই প্রথম আমি আবিষ্কার করিলাম যে, শ্রবণশক্তির মতো আমার দৃষ্টির সীমাও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

এখানে আসিয়া অশরীরীর প্রভাব সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলি নাই।

বলিব আর কি, বলিবার আছেই বা কি, আর বলিলেই বা লোকে বিশ্বাস করিবে কেন! ভাবিতাম অশরীরী এমন করিয়া আমার কান ও চোখের সীমানা বাড়াইয়া দিতেছে কেন? অশরীরীর প্রভাবের সহিত যে এই শক্তিবৃদ্ধি জড়িত সে বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র ছিল না।

এখানে কাহারও কোন কাজকর্ম ছিল না—বাড়ীর টানা বারান্দায় বসিয়া সকলে তাসপাশা খেলিত ও হল্লা করিত। আমি তাহাদের সঙ্গ এড়াইয়া পাহাড়ের উপরে একটি ছাল-ওঠা অর্জ্জুন গাছের তলায় গিয়া বসিতাম। এখানে বসিলে দিগন্তের পাহাড়ের অর্দ্ধচন্দ্র ও অরণ্য রেখা দেখিতে পাইতাম। উপত্যকার সমস্ত দৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট দেখিতাম। বনের সমস্ত গাছপালাগুলা স্পষ্ট দেখিতে পাই কিনা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল। বনটার দিকে ভালো করিয়া তাকাইলাম। কি আশ্চর্য্য আমার চোখে বন আর গাছপালার ঘনীভূত সমষ্টি নয়। প্রত্যেকটি গাছ, তাহার শাখা প্রশাখা পত্রপল্লব লইয়া স্বতন্ত্রভাবে যেন দেখিতে পাইতেছি। নিজের শক্তিতে নিজেই ভীত হইলাম। যেন চোখ দুটি ও কান দুটি কোন এক জাদুকরের—আমি হতবুদ্ধি দর্শক মাত্র।

অশরীরী

রাতের বেলার উপসর্গ আরও বিচিত্র; বুঝিলাম অশরীরী ক্রমেই আমার বুদ্ধিকে মোহগ্রস্ত করিয়া ফেলিবে, অবশেষে শেষ গ্রাসে দেহটাকে হয়তো আত্মসাৎ করিয়া বায়ুরূপ বায়ুতে মিলিয়া যাইবে। রাতের বেলাতেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাসপাশা ও গানবাজনা চলিত বলিয়া স্বতন্ত্র একটি ঘরে আমার শুইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সে ঘরে আর কেহ থাকিত না।

এই ঘরটির একটি দেয়ালে বিহারের পূর্বতন এক ইংরাজ গভর্ণরের একখানি ছবি টাঙানো ছিল। এক সময়ে সখ করিয়া টাঙানো হইয়াছিল, এখন খুলিয়া ফেলিলেও চলিত, কিন্তু নিতান্ত অবহেলাতেই খোলা হয় নাই। আমার ইচ্ছা হইল, ছবিখানি খুলিয়া ফেলি, কিন্তু ততখানি উদ্যম হইল না। একবার ভাবিলাম খুলিয়া না ফেলিয়া ঘুরাইয়া দিই। গভর্ণর বিমুখ হইয়া বিরাজ করিতে থাকুক, তাহাও হইয়া উঠিল না। রাত্রে ঘুমাইলাম কোন বিঘ্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভোর বেলা উঠিয়া ছবিখানার দিকে চাহিতেই দেখিলাম সেখানা ঘুরানো অবস্থায় আছে। চমকিয়া উঠিলাম, একাজ করিল কে? আমার মনের বাসনা জানিল কে? ঘরেই বা ঢুকিল কে? ঘরের দরজা তো এখনো বন্ধ। আমিই স্বপ্নে উঠিয়া একাজ করিয়াছি? বিশ্বাস হইল না। প্রত্যয় হইল যে, এ সেই অশরীরীর কাজ। ছবিখানা সোজা করিয়া দিলাম, কিন্তু ব্যপারটা কাহাকেও আর বলিলাম না। বলিলেও কেহ বিশ্বাস করিত না, ভাবিত আমি একপ্রকার নূতন ধাপ্পা দিতেছি। আমি সারাদিন আর সকলের হইতে দূরে সেই অর্জ্জুন গাছটার তলায় বসিয়া কাটাইতাম। মন্দ লাগিত না—মানুষের সঙ্গ আমার বিষাক্ত লাগিত।

অশরীরী

এই সময়ে আর একটি নূতন ভাব আমাকে পাইয়া বসিল। আমার মরিতে ইচ্ছা করিত, জীবনের আসক্তি আমাকে একেবারে ত্যাগ করিল। আমার কেবলই মনে হইত এই যে, আমার চক্ষু কর্ণের শক্তির বৃদ্ধি, মৃত্যুর পরে মানুষ যে অসীম শক্তি পাইতে পারে, এ কেবল তাহারই পূর্বাভাস। মৃত্যুর ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই পিস্তলটার কথা মনে পড়িয়া যাইত, সেটাকে হাতছাড়া করি নাই, সঙ্গে আনিয়াছি। আরও একটা কারণে মরিতে ইচ্ছা করিত, মনে হইত একমাত্র এই উপায়েই অশরীরীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারি, মনে হইত নিজেও অশরীরী হইয়া একবার শত্রুটার সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া না লই কেন?

রাত্রি বেলা ঘরের মধ্যে কাহার পদশব্দে ঘুম ভাঙিয়া যাইত, বিদ্যুতের টর্চবাতি টিপিতাম, কেহ কোথাও নাই, হঠাৎ চোখে পড়িত দেয়ালের ছবিখানাকে কে যেন ঘুরাইয়া রাখিয়াছে।

এমনি রাতের পর রাত, দিনের পর দিন চলিতে লাগিল। একদিন অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে বাড়ীর সকলের সহিত আমার ঝগড়া হইয়া গেল, এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, দোষটা সম্পূর্ণই আমার। আমি সেদিন সন্ধ্যার ট্রেণে চুণার রওনা হইলাম। গাড়ীতে উঠিবার সময়ে স্পষ্ট বুঝিলাম অশরীরী আমার সঙ্গ ছাড়ে নাই, সেই গাড়ীতেই সে উঠিল।

কামরাটিতে আর একজন মাত্র ছিল—একটি বার্থে তাহার শয্যা দেখিতে পাইলাম, কিন্তু লোকটি কোথায়? স্নানের ঘরে আলো দেখিয়া দেখিয়া বুঝিলাম, আমার সহযাত্রী সেখানে। আমি একাকী আমার বার্থে বসিয়া রহিলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুম আসাতে শুইয়া

পড়িলাম। যখন নিদ্রা ভাঙিল মোকামা জংসন ছাড়াইয়াছি। পাশের বেঞ্চিতে সহযাত্রীর শয্যা দেখিতে পাইলাম, কিন্তু লোকটি কোথায়? ভাবিলাম এখনো কি স্নানের ঘরেই আছে? হওয়াই সম্ভব আলো জ্বলিতেছে। ভাবিলাম, লোকটা দীর্ঘকাল সেখানে কি করিতেছে? দরজায় কান পাতিয়া শুনিলাম যে, ভিতরে কে যেন গুণ গুণ করিয়া গান করিতেছে—আর দরজায় ঘষা কাচের উপরে একটা অস্পষ্ট ছায়ার মতও দেখিতে পাইলাম। বুঝিলাম, মানুষ ভিতরে আছে এবং সে আমার সহযাত্রী ছাড়া আর কেহ নয়। কিন্তু লোকটা এতক্ষণ ধরিয়া কি করিতেছে? কৌতূহল বাড়িল। দরজায় টোকা মারিলাম, ভিতরে কে—বলিয়া চীৎকার করিলাম, কিন্তু ভিতর হইতে কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া দরজায় ধাক্কা দিতে সুরু করিলাম। দরজার ভিতর দিকের ছিটকিনি খট্ করিয়া খুলিয়া গেল, কিন্তু দরজা খুলিল না। মনে হইল কে যেন ভিতর হইতে প্রাণপণ বলে দরজা ঠেলিয়া আছে। দরজা খুলিয়া কোন লোককে বিব্রত করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। একবার সাড়া দিলেই আমি নিরস্ত হইতাম। কিন্তু সাড়া না পাওয়াতে এবং দরজার প্রতিরোধ বৃদ্ধি পাওয়াতে আমার রোখ চড়িয়া গেল—আমি দরজা ঠেলিতে লাগিলাম, অবশেষে সেই উদ্যমে কপালে ঘাম দেখা দিল।

এমন সময়ে ছোট একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। একজন যাত্রী উঠিল। সে আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া বলিল—কি খুলতে পারছেন না?

এই বলিয়া সে দরজায় হাত দিতেই অনায়াসে খুলিয়া গেল।

ভিতরে না আছে লোক, না আছে আলো। আমি বিদ্যুতের টর্চ লইয়া ভিতরে ঢুকিলাম, কোন লোক যে আজ সারাদিনের মধ্যে ঢুকিয়াছিল তাহার চিহ্ন অবধি নাই। তখনই মনে হইল একি সেই অশরীরীর কাণ্ড? ওই শয্যার মালিক কি সেই অশরীরী? আমি ফিরিয়া আসিয়া ভদ্রলোকটির সঙ্গে গল্প করিয়া রাত কাটাইয়া দিলাম, কিন্তু বুকের ভিতরের কাঁপুনি কিছুতেই থামিল না। চুনারে নামিবার সময় অবধি বিছানার মালিকের দেখা পাইলাম না।

চুনার পৌঁছিতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল। ষ্টেশনে নামিয়া একজন ওই দেশীয় লোকের সহিত আলাপ করিয়া লইলাম, তাহার কাছে সন্ধান লইয়া একখানা এক্কা গাড়ীতে চড়িয়া গঙ্গার ধারে একটি প্রকাণ্ড পুরাতন অট্টালিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে একজন কেয়ারটেকার দারোয়ান ছিল। তাহাকে শুধাইলাম, এ বাড়ীতে থাকিতে পারা যাইবে কিনা এবং কিরূপ ভাড়া লাগিবে?

দারোয়ানজী বলিল—আপনার যতদিন খুশি থাকুন, খুশি হইয়া যাহা দিবেন তাহাই যথেষ্ট।

আহারের ব্যবস্থার কি করা যাইবে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—'বর্তন উর্তন' তাহার কাছেই পাওয়া যাইবে আর 'রসুই' করিবার জন্য একটা লোকও সে ঠিক করিয়া দিতে পারে। 'লেকিন মছলি উছলি' চলিবে না। আমি ধন্যবাদ দিয়া তাহার সাহায্য গ্রহণ করিলাম এবং জানাইয়া দিলাম যে মছলি খাইবার ইচ্ছা আমার নাই। তখন দারোয়ানজী সোৎসাহে তাহার প্রতিশ্রুতি পালনে লাগিয়া গেল।

বাড়ীটি প্রকাণ্ড ও পুরাতন, আগেই বলিয়াছি। আধুনিক কৃপণ কল্পনার যুগে এত বড় অনাবশ্যকের আকাশ-ভরা বাড়ী কেহ তৈয়ারী

করে না। বাড়ীর ঠিক সমুখেই গঙ্গা—এখন বসন্তকালে বাড়ীর কাছে অনেকটা চর পড়িয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া নদীর বিস্তৃতি অল্প নয়। গঙ্গার উপরেই প্রশস্ত টানা বারান্দা। আমার ব্যবহারের জন্য দুটি ঘর পাইলাম, একটি বসিবার, অপরটি শুইবার। বসিবার ঘরে পুরু গদিওয়ালা খানকতক চেয়ার ও টেবিল। আর শয়নঘরে একখানা মস্ত পালঙ্ক, পাশে একটা চেয়ার, টেবিল, আলনা। আর আছে ঘরের দেয়ালে মানুষপ্রমাণ পিতলের ফ্রেমে বাঁধানো একখানা আয়না।

আহার শেষ করিতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বারান্দায় বসিয়া কাটাইয়া দিলাম। রাত্রে অল্প কিছু আহার করিয়া শুইয়া পড়িলাম। অনেকদিন পরে এই আমার বিঘ্নহীন সুনিদ্রা হইল। ভোরবেলা উঠিয়া মনে আনন্দ অনুভব করিলাম, ভাবিলাম তবে বোধ হয় অশরীরীর হাত হইতে বাঁচিয়া গেলাম। আজ তিন চার মাসের মধ্যে নির্বিঘ্ন নিদ্রার আরাম আমি পাই নাই, শরীর ভাঙিয়া পড়িবার মতো, মৃত্যু-ইচ্ছার সেটাও একটা কারণ। যেটুকু ঘুম আমার হইত, তাহা যেন ওই অশরীরীর নেপথ্যবিধানের সুবিধার জন্যই হইত। নিদ্রার অবসরে হয় গেলাশের জল ফুরাইত, নয় ছবিখানি ঘুরিয়া যাইত। ঘুম এবং ঘুম না হওয়া দুই-ই আমার পক্ষে সমান আতঙ্কের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গত রাত্রের নিশ্চিন্ত ঘুমে তাই প্রফুল্ল বোধ করিলাম।

ভিখু নামে এক ছোকরা ভৃত্যকে দারোয়ানজী ঠিক করিয়া দিয়াছিল। সে কাজ কর্ম সব জানে। চা, জলখাবার, ডালভাত, তরকারী, রুটি পুরি যাহা প্রয়োজন সমস্ত সময় মতো করিয়া আনিত। ঘর ঝাড়ু দিত, বিছানা পাতিয়া দিত। কোন বিষয়ে আমার ভাবিবার

আবশ্যক ছিল না। আমি সারাদিন বসিয়া, গড়াইয়া, বেড়াইয়া কাটাইয়া দিতাম।

চুনার প্রবাসের দ্বিতীয় দিন বিকালে আমি গঙ্গার তীর বরাবর বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনেক দূর গিয়া প্রাচীন বয়সের ঝাউ-গাছেঘেরা একটি সমাধিস্থান দেখিতে পাইলাম। অনেকগুলি মুসলমানের কবর। কবরগুলি এখনো সুরক্ষিত। পাশেই ছোট একখানা খাপরার ঘরে একজন বৃদ্ধ মুসলমান বাস করে। তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিলাম যে, এই কবরগুলি রক্ষা ও মেরামত করিবার জন্য ছোট একটি জায়গীর আছে—সে তার মালিক বা জিম্মাদার। তাহার মুখেই শুনিলাম যে, বহুকাল আগে এখানে হুমায়ূন বাদশার সঙ্গে শেরশাহের জবর লড়াই হইয়াছিল। অনেক মোগল পাঠান মরিয়াছিল। হুমায়ূন বাদশাহি লাভ করিবার পরে এখানকার কবরগুলির খবরদারির জন্য জায়গীর দান করেন। সেই জায়গীরের ধারা আজিও অক্ষুন্ন আছে।

ইতিহাসে শেরশাহ ও হুমায়ূনের লড়াইয়ের কথা পড়িয়াছি বটে। আর ওই যে অদূরে গিরিচূড়ায় চুনার গড় তাহাও সুবিদিত। গিরিচূড়াবলম্বী সেই গড়ের ছায়াতে চিরনিদ্রিত এই কবরগুলির উপরে প্রাচীনকাল যেন সযত্নে অঞ্চল বিছাইয়া দিয়াছে। স্থানটি যেমন নির্জন, তেমনি মনোরম। সমুখে গঙ্গা, পিছনে স্তম্ভিত চুনার গড়—আর চারদিকে শ্মশানের ধূমের মতো ধূসর ঝাউ গাছ, ইতিহাসের দীর্ঘ নিশ্বাস যেন তাহাদের শাখায় শাখায় নিরন্তর শ্বসিত হইতেছে। স্থানটি আমার মনকে বড়ই টানিল, আমি সেখানে বসিলাম। কতক্ষণ এরকম বসিয়াছিলাম জানি না—যখন হুঁশ হইল, দেখিলাম গঙ্গার ওপারে

তৃতীয়ার অস্তমান চন্দ্রকলা গাছের আড়াল দিয়া হুমায়ুনের গুপ্তচরের মতো এ পারের পরিপ্রেক্ষিতকে লক্ষ্য করিতেছে। আমি উঠিয়া বাসার দিকে রওনা হইলাম। সমুদ্রের জোয়ারের গর্জ্জনেব মতো ওই ঝাউয়ের একটানা হু হু শব্দ কান ভরিয়া লইয়া রওনা হইলাম।

পরদিন বিকালে বেড়াইতে বাহির হইবার সময়ে আমার নূতন জুতাজোড়া পাইলাম না, সন্দেহ হইল এ ভিখুর কাজ। তাহাকে ডাকিলাম, শুনিলাম সে বাজারে গিয়াছে। অগত্যা আর এক জোড়া জুতা পরিয়া বাহির হইলাম। সেই ঝাউ-ঘেরা গোরস্থানে গিয়া পৌঁছিলাম। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া এক জায়গায় বসিলাম। এমন সময়ে গোরস্থানের রক্ষক সেই বৃদ্ধ মুসলমান আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। শুধাইলাম, খবর কি? সে বলিল—বাবুজি, কাল অনেক রাত্রে দুই বাবু এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই কেহ বোধ হয় এক জোড়া জুতা ফেলিয়া গিয়াছেন।

তারপরে নিবেদন করিল আমি যেন খোঁজ করিয়া জুতা-জোড়া মালিককে দিই। আমি তাহাকে জুতা আনিতে বলিলাম। লোকটা জুতা আনিলে আমি চমকিয়া উঠিলাম—একি! এযে আমার জুতা!

আমার বিস্ময় তাহার কাছে প্রকাশ না করিয়া বলিলাম—কি রকম লোক, আর-একবার বলো তো।

সে বলিল—বাবুজি, আমি অন্ধকার রাত্রে দূর হইতে দেখিয়াছি—কি রকম লোক কেমন করিয়া বলিব? তবে দুইজন লোক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তাহার কথায় আমার বিস্ময় বাড়িয়া ত্রাসে পরিণত হইল। আমি

খোঁজ করিয়া মালিককে দিব জানাইয়া জুতা জোড়া একটা কাগজে মুড়িয়া লইয়া আসিলাম।

বাসায় আসিয়া ভাবিলাম এ কেমন হইল? আমিই কি রাত্রে সেখানে গিয়াছিলাম? স্বপ্নে বা নিশিতে পাইলে লোকে এমন বেড়াইয়া থাকে শুনিয়াছি—তবে কি আমারও সেই রোগ হইল! কিন্তু সঙ্গের দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে? সেই অশরীরী নয় তো? তবে কি সেই অজ্ঞেয় সত্তা অশরীরী নয়? নতুবা কবররক্ষক তাহাকে দেখিল কি ভাবে? অজ্ঞাতসারে ঘুমের ঘোরে আমি কি তাহার ভ্রমণসঙ্গী হইয়া উঠিয়াছি নাকি? এই কথা মনে হইবামাত্র সেই নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে গা ছাঁৎ করিয়া উঠিল—দেহের প্রত্যেকটি লোম খাড়া হইয়া উঠিল। সঙ্কল্প হইল আজ হইতে রাত্রে আর ঘুমাইলে চলিবে না। স্থির করিলাম দিনের বেলা ঘুমাইয়া লইয়া রাতটা জাগিয়া কাটাইব।

রাত্রিটা জাগিবার সঙ্কল্প করিলাম! হঠাৎ বোধ হয় একবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম—দরজায় করাঘাতের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। কে—বলিয়া চীৎকার করিলাম—আর কোন সাড়া নাই। আবার জাগিবার চেষ্টা চলিল—বোধ করি একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল—আবার দরজা নাড়ার শব্দ।

বুঝিলাম এ সেই অশরীরীর ক্রিয়া। বুঝিলাম অশরীরী আজও তাহার ভ্রমণসঙ্গীর সন্ধানে আসিয়াছে, কাজেই এবারে আর সাড়া দিলাম না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। এমনিভাবে ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া রাতটা কাটিয়া গেল।

তারপরে প্রতি রাত্রে এমনিধারা চলিতে লাগিল। জাগরণে ও তন্দ্রায় আমার চোখে মল্লযুদ্ধ চলিতে থাকে—যেমনি একটু তন্দ্রা আসে,

অমনি দরজা নাড়ার শব্দ, নতুবা বাহিরে পদধ্বনি শুনিতে পাই। একদিন হঠাৎ পিঠের উপরে কাহার তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করিয়া ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিলাম। ঘর নির্জ্জন, কেহ কোথাও নাই।

কয়েকদিন এমনি চলিলে আমার শরীর আরও ভাঙিয়া পড়িল! ভাবিলাম এ রকম চলিতে থাকিলে এই বিদেশেই মরিতে হইবে। আমার কেমন যেন ধারণা হইয়া গিয়াছিল এ যাত্রা আমাকে মরিতেই হইবে—ভাবিলাম মরিতেই হয় তো কলিকাতা ফিরিয়া মরিব—বিদেশে বিভূঁয়ে মরিব কেন? এতক্ষণ বারান্দায় বসিয়াছিলাম, এবারে কি একটা কাজে ঘরে ঢুকিতেই মনে হইল আয়নার মধ্যে যেন কাহার ছায়া? আবার তাকাইলাম শূন্য আয়না ঝক্ ঝক্ করিতেছে, ঘরের মধ্যে কেহ কোথাও নাই।

একবার মনে হইল আমার ছায়া—পরক্ষণেই বুঝিলাম আমার ছায়া হইতেই পারে না, কারণ আমি যেখানে দাঁড়াইয়া সেখানকার ছায়া আয়নায় পৌছায় না। তবে এ কী দেখিলাম! বিশ্বাস জন্মিল যে, আমি কোন দুর্জ্জ্যেয় সত্তার ষড়যন্ত্রের শিকার।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বেড়াইয়া সবে ঘরে ঢুকিয়াছি, দেখিলাম, স্পষ্ট দেখিলাম, মনে হওয়া বা অনুমান করা নয় যে, আয়নার উপরে ছায়া। শুধু এক বিদ্যুৎ ঝলকের জন্য, শুধু জলে দাগ কাটার মতো, কিন্তু সত্যই যে দেখিলাম তাহাতে সন্দেহ নাই। তখনি মনে পড়িল—ঘর তো অন্ধকার, এখনো আলো জ্বালানো হয় নাই, তবে ছায়া পড়িবে কি উপায়ে? বিদ্যুতের টর্চ টিপিলাম। শূন্য ঘর। ঘরের সেই সুবৃহৎ শূন্যতাকে একটা বিরাট হাঁ-র মতো মনে হইল।

অবশেষে কিভাবে আমার ত্রাস যে রোখে পরিণত হইল সে প্রশ্নের

উত্তর দিবার সাধ্য আমার নাই, তবে আমার ধারণা এই যে, কোন একটা মনোভাব চরমে পৌঁছিলে তাহা অপর একটা মনোভাবে পরিণত হয়, মানুষের মনের সব ভাবগুলার মধ্যে গোপন চলাচলের একটা পথ আছে বলিয়াই এমন বোধ করি সম্ভব হয়।

আমার মাথায় রোখ চাপিয়া গেল যে, মরিতেই যখন হইবে, মরিতেই যখন বসিয়াছি—অশরীরীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া মরিব, আর কিছু না পারি তাহাকে শিকারের আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া মরিব। মৃত্যু যখন আমার আসন্ন, মনে হইল—এইভাবে মরিলেই আমার মরা সার্থক হইবে। আমি স্থির করিলাম যে, আর দুই এক রাত্রি অশরীরীর রহস্যোদ্ঘাটনের শেষ চেষ্টা করিব। পারি তো উত্তম, না পারি তো নিজের প্রাণ নিজের হাতে লইব, অশরীরীর শিকারে পরিণত হইব না। এখন হইতে গুলীভরা পিস্তলটা সর্বদা পকেটে রাখিতে লাগিলাম।

সেদিন রাত্রি আমার জীবনের শেষ রাত্রি হইবে যখন ভাবিয়াছিলাম তখন কে জানিত যে, সেই রাত্রিই আমার মোহমুক্তির রাত্রি হইবে।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বারান্দায় বসিয়াছিলাম—বলা বাহুল্য—একাকী। রাত্রি ঘন অন্ধকার—দূরাগত ঝাউগাছের হু হু শব্দ পরলোকের তীরভূমি হইতে বাহিত দীর্ঘনিশ্বাসের মতো শ্রুত হইতেছিল; সমুখে গঙ্গা—সেখানে অন্ধকার কিছু ফিকা, নতুবা বুঝিবার আর কোন উপায় নাই। বসিয়া বসিয়া একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, এমন সময় মনে হইল, ঘরের মধ্যে কে যেন শিস্ দিতেছে। দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম—আজ আমার মনে আর ভয় ছিল না। অশরীরীকে গুলী বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা সম্ভব হইলে অবশ্যই করিতাম, কিন্তু মনের ওই

অবস্থাতেও বুঝিয়াছিলাম যে, তাহা সম্ভব নয়, তাই নিজেই মরিব। অশরীরীর উপস্থিতিতে নিজের হাতেই মরিব, তাহার শিকার ফস্‌কাইয়া যাইবে, সে হতাশ হইবে। সে কি আনন্দ! ঐ এক আনন্দই তখন জীবনে অবশিষ্ট ছিল। উৎকট উল্লাসে হাসিয়া উঠিলাম। অনেক দিন হাসি নাই; এত উচ্চস্বরে কখনো হাসি নাই, নিজের হাসিতে নিজে চমকিয়া উঠিলাম। হঠাৎ সেই ছায়া, ঈষদালোকিত কক্ষের আয়নার উপরে সেই ছায়া—শুধু এক পলকের জন্য। পিস্তল বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। দরজাটা খোলা ছিল, বন্ধ করিয়া আসিলাম। তখন আমার মুখ দরজার দিকে। আমার ঠিক পিছনে দেয়ালের গায়ে আয়না। পিছনে সেই শিস্ দিবার শব্দ। পিছন ফিরিবামাত্র ছায়াশরীরী অশরীরী। মনে হইল সে যেন আর আয়নার উপরে নাই। আমার দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। কি করিতেছি ভাবিয়া দেখিবার আগেই পিস্তল তুলিয়া নিজের মাথা লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুঁড়িলাম, কেবল তড়িদ্‌বেগে মনে হইল, আমার ঠিক পিছনে সে যখন রহিয়াছে, সেও মরিবে। এক গুলীতে শিকার ও শিকারীর দুইজনেরই জীবনাবসান।

বোধ হয় হাত একটু কাঁপিয়া গিয়াছিল। শূন্যঘরে পিস্তলের শব্দ মাথা কুটিতে লাগিল। পিছন হইতে একটা নিদারুণ, নিষ্ঠুর হাসির খন্ খন্ শুষ্ক আওয়াজ কানে আসিল, মনে হইল অশরীরী আমার ব্যর্থ চেষ্টাকে ধিক্কার করিয়া হাসিতেছে। চারিদিকে বারুদের গন্ধ। ঘরের মেঝে কাঁপিতেছে, ছাদ ঘুরিতেছে, সমস্ত অন্ধকার।

*   *   *   *   *

পরদিন যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম আমি শয্যার উপরে শায়িত,

ভিখু মাথায় বাতাস করিতেছে। পায়ের কাছে দারোয়ানজী গম্ভীর মুখে দণ্ডায়মান। শিমুলতলার ঠিকানায় একটা তার করিতে বলিয়া আবার আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙিল দেখিলাম যে, আমার পরিবারের জন তিনেক কাছে বসিয়া আছে। তাহাদের বলিলাম—আজই আমাকে এখান হইতে লইয়া চলো।

পরদিন প্রাতে শিমুলতলায় আসিয়া পৌছিলাম।

এই ঘটনার পরে পাঁচ সাত বৎসর অতীত হইয়াছে, এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক। অশরীরীর স্মৃতি আমার মনে ফিকা হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সত্য করিয়া বলি এই রহস্যের উত্তর আজও পাই নাই। ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করিয়া সেই পুরাতন উত্তর পাইয়াছি। 'নার্ভাস শক।' মনস্তাত্ত্বিকদের জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইয়াছি—সমস্ত ব্যাপারটাই একটা 'সাব্‌জেকটিভ রিঅ্যাকশন।' বন্ধুরা বলে আমি ধাপ্পা দিতেছি কিন্তু আমি জানি, মর্মান্তিকভাবে জানি সমস্তই নিদারুণ সত্য। কেমন করিয়া না জানি অশরীরীর মোহময় খোলসের মধ্যে আমি ঢুকিয়া পড়িয়াছিলাম—সেই রাত্রের পিস্তলের গুলী সেই মোহ-ভেদ করিয়া দিয়া আমাকে বাঁচাইয়া দিয়াছিল। অশরীরীর নিজের ব্যর্থতায় আত্মধিক্কারের অট্টহাস্য করিয়া আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। বন্ধুরা বলে ওসব তোমার কবিত্ব। যাহাকে ধিক্কারের অট্টহাস্য বলিতেছ বস্তুত তাহা পিস্তলের গুলী লাগিয়া সেই বৃহৎ আয়নাখানা ভাঙিবার শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি বুঝাইতে পারি না, চুপ করিয়া থাকি।

স্বপ্নলব্ধ কাহিনী

লেখকজীবনের ট্র্যাজেডি এই যে, লিখিবার কিছু না থাকিলেও লিখিতে হয়। শরীর খারাপ বলিলে কেহ বিশ্বাস করে না, ভাবে ওটা বাড়াবাড়ি হইতেছে; সময় নাই বলিলে ভাবে ওটা চাপ দিয়া কিছু অতিরিক্ত টাকা আদায় করিবার অজুহাত মাত্র। কাজেই হতভাগ্য লেখককে, যুগপৎ পিছনের ঠেলায় ও সামনের টানে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া যাইতে হয়। আমার লিখিবার অভ্যাস আছে, লেখার প্রেরণায় যে লিখি এমন মনে করিবার কারণ নাই, নিতান্তই আর কিছু করিতে পারি না বলিয়া লিখিয়া যাই। সেটা বিস্ময়ের নয়, বিস্ময় এই যে, এমন লেখাও সম্পাদকগণ কাঞ্চনমূল্যে কিনিয়া ছাপিয়া থাকেন। মাঝে মাঝে সম্পাদকচক্রের ষড়যন্ত্র হইতে মুক্তি পাইবার আশায় আমি নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়া পড়ি, মাথাটা বিশ্রাম পায়। আমার নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইবার সময় পূজার ছুটি, আকাশ যখন নির্মল হইয়া ওঠে, উত্তরে বাতাসে শিউলিফুলগুলি যখন স্নেহ সম্ভাষণের মতো টুপ টুপ করিয়া ঘাসের উপর পড়িতে থাকে, আর প্রত্যেক তৃণ-পল্লবের আগায় একটি করিয়া শিশির বিন্দু দেখা দেয়, সেই নিরাময় শরৎকালে আমি কিছুদিনের জন্য বাহির হইয়া পড়ি।

সেবার এই উদ্দেশ্যে হাওড়া স্টেশনে গিয়া পৌছিয়াছি, জিনিসপত্র গাড়ীর কামরায় তোলা হইয়াছে, আমি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া একটি চুরুট সবে ধরাইয়াছি—এমন সময়ে পিছন হইতে কে নাম ধরিয়া ডাকিল! ফিরিয়া দেখি—পত্রের সম্পাদক। ব্যাপার কি শুধাইবার আগেই

ব্যাপারখানা কি তিনি আগেই জানাইয়া দিলেন—একটি গল্প চাই। বলিলাম, দেখছেন আমি তো বেরিয়ে পড়েছি। তদুত্তরে তিনি সন্তর্পণে কয়েকখানি নোট আমার মুঠার মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া বিনীতভাবে হাসিলেন, ভাবটা এই যে, এবারে তো হইল, আর কোন অজুহাত চলিবে না। সত্য কথা বলিতে কি, নোট কয়খানা ফেরৎ দিবার মতো সৎসাহস আমার হইল না। বলিলাম, কিন্তু কবে যে পাবেন স্থির নাই। সম্পাদক বলিলেন, যখন খুশী দেবেন, অর্থাৎ টাকা যখন একবার গিলিলেন তখন লেখা কি করিয়া আদায় করিয়া লইতে হয় তাহা যদি না জানি তবে সম্পাদকতা করিতেছি কেন? যাই হোক সম্পাদককে নমস্কার করিয়া বিদায় করিয়া দিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সাধারণতঃ আমার নিরুদ্দেশ বাসের ঠিকানা কেহ জানিতে পায় না। তার কারণ বেড়াইতে বাহির হইবার কয়েকদিন আগে একবার অজ্ঞাতবাসের স্থান খুঁজিতে নিজে বাহির হই এবং অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া একটা সৃষ্টিছাড়া জায়গায় একটা লক্ষ্মীছাড়া আবাস নির্দ্দিষ্ট করিয়া আসি। এবারে চলিয়াছি বেঙ্গল নাগপুর রেলপথে। পুরুলিয়া হইতে টাটানগর পর্য্যন্ত ছোটনাগপুরের ভূখণ্ডে অনেকগুলি ছোটোখাটো রেল ষ্টেশন আছে। তাহাদেরই মধ্যে একটা জায়গাকে বাছিয়া লইয়াছি। জায়গাটি শুধু নির্জ্জন নয়, এ যেন সংসার কর্তৃক সম্পূর্ণ বিস্মৃত। দিনের মধ্যে খানকতক উজান ভাটি রেলগাড়ী পুরাতন স্মৃতির মতো হু হু করিয়া চলিয়া যায়, সবগুলি থামে না, তারপরই সব আবার পূর্ব্ববৎ, নিস্তব্ধ, নির্জ্জন, বিস্মৃত। স্টেশনটির নাম গোপন রাখিলাম, আরও একবার যাইবার ইচ্ছা আছে, সম্পাদকগণের কবলে পড়িতে চাই না।

অশরীরী

প্রকৃত নাম গোপন করিয়া জায়গাটিকে বিরামপুর বলিয়া উল্লেখ করিব। বিরামপুরের স্টেশনমাস্টার আমাদের দেশের লোক। তিনি আমার নির্জ্জনবাসের অভ্যাস জানিতেন। এবার পূজার আগে তিনি লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, একবার বিরামপুরে আসুন, ইহার চেয়ে নির্জ্জনতর স্থান আর পাইবেন না। তাঁহার আহ্বানে বিরামপুরে গিয়া স্টেশন হইতে মাইলখানেক দূরে একটি বাড়ি স্থির করিয়া আসিয়াছিলাম। বাড়ীটি বৃহৎ, খুব পুরাতন না হইলেও পরিত্যক্ত পড়িয়া থাকায় অল্প বয়সেই জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহার বর্ত্তমান মালিক বরাহভূমের এক ইংরাজ পাদ্রী। বাড়ীটি সে কিছুকাল আগে কিনিয়া, ছিল, কাহার কাছ হইতে জানি না। পাদ্রী সাহেবেব ইচ্ছা ছিল যে এখানে একটি অনাথ আশ্রম স্থাপন করিবে। কিন্তু পরে মত পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা বরাহভূমে স্থাপন করিয়াছে। বরাহভূম স্টেশন এই লাইনেই, কুড়ি পঁচিশ মাইল দূরে। পাদ্রী সাহেবের কাছে নামমাত্র ভাড়ায় বাড়িটি একমাসের জন্য লইয়াছিলাম। ষ্টেশন মাষ্টার বলিলেন যে, আপনি আসিলে ঠাকুর ও চাকরের একজন 'কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড' নিযুক্ত করিয়া দিব।

হাওড়া হইতে রওনা হইয়া পরদিন বেলা দশটার মধ্যেই বিরামপুর আসিয়া পৌছিলাম। সে বেলা ষ্টেশনমাষ্টারের বাসাতেই স্নানাহার সম্পন্ন করিলাম। বিকাল বেলা একখানা গরুর গাড়ীতে মালপত্র তুলিয়া লইয়া বাড়িটির দিকে চলিলাম। সঙ্গে ষ্টেশনমাষ্টার চলিলেন। তিনি 'ঝরকু' নামে একজন স্থানীয় লোককে কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। সে আগেই গিয়া বাড়ীটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া বাসযোগ্য করিতে লাগিয়া গিয়াছিল। মাঠ পার হইয়া আধ-

ঘণ্টার মধ্যেই বাড়িতে গিয়া পৌঁছিলাম। ষ্টেশন ও বাড়িটির মধ্যে একটি উচ্চ ভূখণ্ড, নতুবা এক স্থান হইতে অপর স্থানটি দেখা যাইত। বাড়ির পাশে দাঁড়াইলে ষ্টেশনের সিগন্যাল বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা পৌঁছাইতেই ঝরকু চা করিয়া আনিল। দুইজনে চা পান করিলাম। স্টেশনমাস্টারবাবু প্রতিদিন একবার করিয়া আসিয়া খোঁজ লইয়া যাইবেন বলিয়া বিদায় লইলেন। আমি ভগ্ন প্রাসাদের একক অধীশ্বর হইয়া বারান্দায় একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলাম।

বাড়িটার সম্মুখে বাগান আছে কিম্বা ছিল বলাই উচিত এখন তাহার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে, দু'চারটি টগর, করবী ফুলের গাছ ছাড়া অন্য গাছ নাই। বাড়িটির চারদিক ঘেরিয়া টানা বারান্দা—মাঝখানে বড় একটি হল, দু কোণে দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর। অদূরে পাকশালা, ভৃত্যনিবাস প্রভৃতি। কাছেই একটি ইঁদারা, ইঁদারার পাশে গোটা দুই মহুয়া ও অর্জ্জুন গাছ। বাড়িটি দেখিলে মনে হয় যে, সৌখীন লোকের হাতে তৈয়ারী হইয়াছিল, কিন্তু কোন কারণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বাড়িটির সুখের অবস্থা গত, এখন কোনরূপে খাড়া হইয়া আছে মাত্র। ভাবিলাম, আমি সুখের সন্ধান করিতে আসি নাই, নির্জনতা আমার কাম্য, এমন অজ্ঞাতবাসের স্থান আর পাইব না।

বাড়ির বারান্দায় চৌকি লইয়া বসিলে চোখের দৃষ্টি সুদীর্ঘ ছাড়া পায়, একেবারে বাধে গিয়া দিগন্তের গিরিমালায়। বাড়িটার সামনেই একটি রিক্তমাঠ—উঁচু হইয়া চলিয়া গিয়াছে—তার পরেই প্রথমে চোখে

পড়ে সুবর্ণরেখা নদীর অপর তীর, এদিকের তীরটা মাঠের স্ফীতির আড়ালে গুপ্ত। নদীর পরপারে জনশূন্য, তৃণশূন্য, তরুগুল্ম-শূন্য দগ্ধ প্রান্তর, দিগন্তে সেই অনুর্বর, রুক্ষ পাহাড়ের প্রাচীর। এমন নেড়া পাহাড় জীবনে দেখি নাই, পাহাড় নয় যেন অতিকায় পুরীর ভগ্নপ্রাচীর, ভগ্নপ্রাচীরে যে শ্যামলতাটুকু দেখা যায় তাহারও অভাব। চারিদিকের এমন লক্ষ্মীছাড়া নির্জীব ভাব আর কোথাও দেখিয়াছি মনে পড়ে না। এক একবার মনে হয় যেন পরিচিত পৃথিবীর অংশ নয়, চন্দ্রলোকের মৃত জগতের একটা খণ্ড। কেবল স্বস্তি পাই আকাশের দিকে তাকাইলে—এমন স্বচ্ছ নির্মল নভঃকান্তি বাঙলার লোকে কল্পনা করিতে পারিবে না। বাঙলা দেশে পৃথিবীর শ্যামলতা আকাশের নির্মলতার প্রতিদ্বন্দ্বী—তাই শরতের আকাশও সেখানে পূর্ণ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করে না। আকাশের দিকে তাকাইয়া আমি কল্পনার ভেলা ভাসাই, তাহার সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করিয়া দেবকন্যাগণ মেঘের ভেলা ভাসায়—দুই-ই উদ্দেশ্য-হীনভাবে নিরর্থকতার দিকে ভাসিয়া যায়।

এইভাবে দিন দুই যায়, বিকাল বেলা স্টেশনমাষ্টার আসেন, তাঁহার সঙ্গে ষ্টেশনে গিয়া জনসঙ্গের স্বাদ উপভোগ করিয়া আসি। জনসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে নির্জনতাকে আরও বেশি করিয়া পাই। সন্ধ্যা বেলায় বাসায় ফিরিয়া আসিয়া স্ফুটমান তারাপুঞ্জের দিকে তাকাইয়া বারান্দায় থাকি। ঝরকু একাধিকবার তাড়া দিলে তবে উঠিয়া আহার করিতে যাই। আহারের পরে শয়ন। ছোট কামরা-দুটীর একটীতে আমার শুইবার ব্যবস্থা। আর একটীতে বসি, লিখিবার কিছু সাজসরঞ্জামও সেখানে আছে।

দুই তিন দিন পরে একদিন জামার পকেটে হাত দিতেই কতক-

গুলো কাগজ খচ্‌মচ্‌ করিয়া অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিল। তাহাদের টানিয়া বাহির করিয়া দেখি—তাহারা সম্পাদকের দেওয়া সেই নোটগুলি। সেই নোটের স্মৃতিতে সম্পাদক ও সংসারের কথা মনে পড়িল। ভাবিলাম আর বিলম্ব না করিয়া একটা কিছু লিখিয়া পাঠাইতে হয়, নতুবা সম্পাদক হয়তো এই অজ্ঞেয় স্থানে আসিয়া পড়িবে, সম্পাদকের কিছুই অসাধ্য নয়।

লিখি লিখি করিয়াও সারাদিন লিখিতে বসিতে পারি নাই, সন্ধ্যা-বেলা মনকে অনেককষ্টে সংযত করিয়া লিখিতে বসিলাম। কি লিখিব স্থির ছিল না। এক সময়ে ভাবিতে ভাবিতে লিখিতাম, এমন লিখিতে লিখিতে ভাবি, চলার বেগে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাহাতেই আলো জ্বলে। ভাবিলাম এই বাড়ি ও মাঠের বর্ণনা দিয়াই আরম্ভ করা যাক না কেন। সরোবরে একটী লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা আমার কাজ, তারপরে তরঙ্গবলয় নিজের নিয়মেই ছড়াইয়া পড়িবে! রচনার প্রথম ধাক্কাটা লেখকের অধীন—তারপর হইতে লেখক রচনার নিয়মাধীন হইয়া পড়ে। যাইই হোক, এই মাঠ ও এই বাড়িটির বর্ণনার পরিবেশ রচনা করিয়া কয়েক পৃষ্ঠা লিখিয়া ফেলিলাম, এবারে গল্পের স্বচনা করিবার পালা—কিন্তু গল্পের স্বচনার পূর্বেই নিদ্রার স্বচনা হইল। গল্পের ভার আগামীকল্যের উপর রাখিয়া নিদ্রাজড়িত চোখে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম। রাত্রির দ্বিগুণিত নিস্তব্ধতার প্রান্তে শিবাধ্বনির প্রহর ঘোষণার সঙ্কেতটুকুমাত্রে মনে আছে—তারপরে আর কোন সম্বিৎ রহিল না।

ঘুমাইয়া একটি স্বপ্ন দেখিলাম। অবশ্য ঘুমের মধ্যে স্বপ্নবোধ হয়

নাই, জাগিয়া উঠিবার পরেই স্বপ্ন বলিয়া বুঝিলাম। স্বপ্ন দেখিলাম যে, আমি একটি উৎসব-ভাবাপন্ন বাড়িতে গিয়া যেন ঢুকিয়াছি। চারিদিকে লোকজনের যাতায়াত, আমি সকলকে দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু আমাকে কেহ দেখিয়াও দেখিতেছে না বা দেখিতে পাইতেছে না। আমি বাহির বাড়ি হইতে বাবুদের বৈঠকখানায় গেলাম। তারপরে আরও একটা মহল অতিক্রম করিয়া একেবারে অন্দরমহলে গিয়া পৌঁছিলাম। দেখিতে পাইলাম যে, পুরস্ত্রীগণের কেহ কেহ নিজেরা সাজিতেছে, কেহ কেহ কেহ বা গৃহসজ্জায় ব্যস্ত। তাহারাও যে আমাকে দেখিতে পাইতেছে এমন বোধ হইল না। তাহাদের কথাবার্তা শুনিয়া বুঝিলাম যে, এই বাড়ির একটি মেয়েকে বরপক্ষ আজ দেখিতে আসিবে। তাই উৎসবের আয়োজন বটে। এবারে বিবাহের কনেটিকে দেখিবার কৌতূহল হইল। অন্দরমহলের দোতলার টানা বারান্দা দিয়া চলিয়াছি—আমাকে কেহ দেখিতে পাইতেছে না বলিয়া অবাধ অধিকার। ঈষম্মুক্ত একটি জানালাপথে দেখিলাম যে, তিন চারজন মিশ্র-বয়সের মেয়েতে মিলিয়া একটি তরুণীকে সাজাইতেছে। বুঝিলাম এইটিই বিবাহের কনে। এমন অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে আমি ইতিপূর্ব্বে আর দেখি নাই, যেন ক্ষীরসমুদ্রের চাঁছি। যেমন শুভ্র, তেমনি সুকুমার। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মেয়েটির দুই চোখ হইতে জল ঝরিয়া তাহার দুই গাল ভাসিয়া যাইতেছে। একটি বর্ষীয়সী মহিলা বলিতেছে—মা ইন্দিরা, আজকার দিনে চোখের জল ফেলে না।

মেয়েটির নাম তবে ইন্দিরা।

ইহার পরেই স্বপ্নের পটপরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ইন্দিরার বিবাহ সভা। বরকন্যা মুখোমুখি উপবিষ্ট। বরের চেহারা আমার ভালো

লাগিল না। দেখিতে সে সুপুরুষ নয়। কিন্তু সে অভিযোগ আমার নয়। তাহার মুখে চোখে শিক্ষা-দীক্ষার ছাপের অভাব, পোষাক-পরিচ্ছদ হইতে আচার-ব্যবহার সব তাতেই কেমন একটা অমার্জ্জিত রুচির আভাস। আর সবচেয়ে বেশি করিয়া নজরে পড়িল—তাহার সর্ব্বাঙ্গে, চোখে-মুখে কেমন একটা নির্লজ্জ ক্ষুধার ভাব! তাহার পাশে ইন্দিরাকে রজনীগন্ধার কুঁড়িতে রচিত একটি মূর্ত্তির মতো বোধ হইতেছিল। ইন্দিরা নিস্পন্দ, নিষ্পলক, মূর্তিমতী নিষ্পাপ। মনে হইল এ রকম বি-সমের মিলন কখনই সুখের হইতে পারে না। ইহা কি পূর্ব্বাভাসে ইন্দিরা জানিতে পারিয়াছিল, নতুবা সেদিন তাহার চোখে জল ঝরিয়াছিল কেন, নতুবা আজ তাহার মূর্তি শুভ্র অশ্রু-সমুদ্রের স্ফটিকীভূত পুত্তলির মতো বোধ হইল কেন?

আবার স্বপ্নের পটপরিবর্ত্তন হইল। আমি যেন একটি নূতন বাড়ীতে আসিয়াছি। বাড়িটি চেনা-চেনা মনে হইলেও ঠিক কোথায় দেখিয়াছি বুঝিতে পারিলাম না (স্বপ্নভঙ্গের পরে বুঝিয়াছি বিরামপুরের বাড়ীটাকেই স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম)। রাত্রি তখন অনেক। আমি যেন একটা কক্ষের পর্দ্দাটানা জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম (পরে বুঝিয়াছি যে আমার বর্ত্তমান শয়নকক্ষটিই দেখিয়াছিলাম)। পর্দা একটু ফাঁক করিয়া দেখিলাম, ফুলশয্যার-বিছানা—কেহ নাই। মনে হইল, এ উচিত হইতেছে না। ফিরিয়া যাইব কিন্তু অদৃশ্য কণ্ঠের অর্দ্ধশ্রুত স্বর কেবলি কানের কাছে বলিতে লাগিল—"ফিরিয়া যাইও না, ফিরিয়া যাইও না, সাক্ষী থাকিয়া যাও।" আমি মূঢের মতো দাঁড়াইয়া আছি—এমন সময় দেখিতে পাইলাম যে, পূর্ব্ব-দৃষ্ট ইন্দিরাকে অনুসরণ করিয়া তাহার বর

আসিতেছে। লোকটা বলিতেছে, শোবে এসো। বলিতেছে, এখনো কথা শোন। ইন্দিরা বলিতেছে, না, না, আজ থাক। বর বলিল, সে কি, আজ যে ফুলশয্যার রাত। ইন্দিরা তবু বলিল, কাল হবে। কাল হবে শুনিয়া লোকটা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল—জানো, আমি এখন তোমার মালিক; জানো, আমি যা খুশী করতে পারি।

তারপর একটু থামিয়া বলিল—আমাকে তুমি চেনো না! আমি নিজের হাতে অনেক মানুষ খুন করেছি, আমার বন্দুকের গুলি খুব সিধা চলে।

একথায় ইন্দিরা ভয় পাইল বলিয়া মনে হইল না। সে শান্ত ভাবে বলিল—তবে তাই হোক, তোমার গুলি আর একবার সিধা চলুক, তাতেই আমার শান্তি।

ইন্দিরার উত্তরে লোকটা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া প্রস্থান করিল—বোধ হয় বন্দুক আনিতেই গেল। ইন্দিরা একটা টেবিলের উপর বাম হাতের ভর দিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সপ্তমীর চাঁদের আলো জমাইয়া কঠিন করিয়া লইয়া কোন্ দিব্য-শিল্পী তাহার মূর্ত্তি কুঁদিয়া রচনা করিয়াছে।

আবার পটপরিবর্ত্তন হইল। এবার কেবল কালের পরিবর্ত্তন, স্থানের নয়। আমি পূর্ব্ববৎ সেই জানলার কাছে দাঁড়াইয়া। দেখিলাম, ফুলশয্যার একান্তে ইন্দিরা শায়িতা, নিদ্রিতা, শান্ত, শুভ্র, সুকুমার, নিস্পন্দ তাহার দেহ যেন মন্দাকিনীর খানিকটা জমিয়া তুষারে পরিণত। কিছুক্ষণ পরে তাহার বর প্রবেশ করিল—পুরুষের এমন নির্লজ্জ ক্ষুধার মূর্তি দেখি নাই। সে শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া

বলিতে লাগিল—তবে যে বড় বড়াই করা হয়েছিল—আমার শয্যায় শোবে না! এখন! তোমার নাকি বন্দুকের ভয় নাই?

তারপরে একটু থামিয়া বলিল—ওঃ ঘুমিয়ে পড়া হয়েছে! আচ্ছা কি করে ঘুম ভাঙাতে হয় তা দেখাচ্ছি!

এই বলিয়া সে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের মতো শয্যার উপরে, ইন্দিরার দেহের উপরে বলাই উচিত, লাফাইয়া পড়িল।

এ দৃশ্য আমার দেখা উচিত নয় বলিয়া যতই সরিতে যাই, সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর আমাকে বলে—তুমি যাইওনা, তুমি যাইওনা, সাক্ষী থাকিবার জন্য তোমাকে আনিয়াছি।

লোকটা লাফাইয়া পড়িয়াই পর মুহূর্তে বিষম চীৎকার করিয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল—এ কি! এ কি! এ কি হ'ল!

সে একবার ইন্দিরার মুখে, নাকে, বুকে হাত দিয়া অনুভব করিল, কোথাও কোন স্পন্দন নাই, আশার কম্পমাত্র নাই। সে ত্রাসে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ইহার পরে যাহা দেখিলাম, সত্যই বিষম। ইন্দিরার একখানা বাহু সে নিজের কণ্ঠে জড়াইয়া লইয়াছিল, সে বাহুপাশ হইতে লোকটা আর কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না—বরঞ্চ মনে হইল, তরুণীর বাহুলতা লৌহবলয়ের মত তাহার কণ্ঠ ক্রমশঃ আঁটিয়া ধরিতেছে। স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, তাহার মুখ-চোখ ক্রমে অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহার দম বন্ধ হইবার মতো হইয়াছে, তাহার আর্ত্তনাদ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে স্বর বন্ধ হইবার মতো হইল। এমন সময়ে দপ্ করিয়া ঘরের আলো নিভিয়া গেল। আমার স্বপ্ন মিলাইল

অশরীরী

পাশ ফিরিয়া তাকাইয়া দেখি—জানলা দিয়া শুকতারার জলন্ত সাক্ষ্য দেখা যাইতেছে! আমি লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলাম! মনে হইল—এ কী দুঃস্বপ্ন! এ কী বীভৎস স্বপ্ন! স্বপ্ন যে এমন প্রত্যক্ষ, এমন নিবিড হয়, তাহা আগে জানিতাম না! সারাটা সকাল ইন্দিরার ট্রাজেডি মনের মধ্যে করুণ সুরে গুঞ্জন করিতে লাগিল।

দুপুর বেলা আহারান্তে আমার অর্দ্ধসমাপ্ত গল্পের কাছে গিয়া বসিলাম। খাতাখানা পূর্ব্ববৎ ছিল। কিন্তু পাতা উল্‌টাইতেই বিস্মিত হইলাম! এ কি! এতগুলা পাতা লেখা হইল কি প্রকারে? আমি তো মাত্র চারখানা পাতা লিখিয়াছিলাম। পাতা গুনিয়া দেখিলাম আরও ছাব্বিশ পাতা কে লিখিয়াছে? কিন্তু লিখিল কে? হাতের লেখা তো আমারই দেখিতেছি! কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মূঢ়ের মতো বসিয়া রহিলাম। শেষে ভাবিলাম, পড়িয়াই দেখি না কি লিখিল। খানিকটা পড়িয়াই ভয়ে বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম! এ যে আমার স্বপ্নে-দেখা কাহিনী। গত রাত্রে যে-স্বপ্ন দেখিয়া-ছিলাম, যে-ভাবে দেখিয়াছিলাম, অবিকল তাহাই লিখিত। আরও আশ্চর্য্যের এই যে হস্তাক্ষর আমারই। আর ভাষার যা কিছু বৈশিষ্ট্য তাহাও আমারই। তখন প্রত্যয় হইল—আর কিছু নয়, আমিই স্বপ্নের মধ্যে উঠিয়া আসিয়া গল্পটা লিখিয়া ফেলিয়াছি। যদিচ এমন অভ্যাস আমার ছিল না, তবু সাহিত্যের ইতিহাসে অনুরূপ ঘটনার নজিরের অভাব নাই। তখন অনেকটা স্বস্তি বোধ করিলাম, ভাবিলাম মাঝে মাঝে এমন ঘটিলে মন্দ হয় না। সম্পাদকের একটা দেনা শোধ

হইবার পন্থা হয়। গল্পটা পড়িয়া মন্দ লাগিল না। স্থির করিলাম —কালকের ডাকে সম্পাদককে পাঠাইয়া দিব।

বিকালবেলা স্টেশনমাষ্টারবাবু আসিলেন। তিনি বলিলেন, চলুন আজ সুবর্ণরেখার দিকে যাওয়া যাক।

আমি বলিলাম—সেই ভালো, ও দিকে একেবারে যাওয়া হয় নি।

বাড়ীর সামনে একটা মাঠ। মাঠটা উঁচু বলিয়াই নদীর তীর দেখা যায় না। মাঠ পার হইতেই সুবর্ণরেখা চোখে পড়িল। কিছুক্ষণের মধ্যেই নদীর তীরে আসিয়া পৌছিলাম।

স্টেশনমাষ্টারবাবু বলিলেন—এদিকে আসুন, একটা জিনিষ দেখাই।

উঁচু তীর হইতে নীচে নামিতেই পাশাপাশি দুটো অনুচ্চ স্তম্ভ চোখে পড়িল। কাছে গিয়া স্তম্ভের গাত্রে সংলগ্ন শ্বেত পাথরে খোদিত লিপি দেখিয়াই আমি চমকিয়া উঠিলাম!

ষ্টেশনমাষ্টার শুধাইলেন,—চমকালেন কেন?

চমকাইনি, হুঁচোট খেয়েছিলাম।

আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখ অন্ধকার হইয়া আসিল। শ্বেতপাথরের কালো অক্ষরগুলা ধূর্জটির প্রমথকুলের মতো চোখের উপরে নাচিতে লাগিল। অনেক কষ্টে মন সংযত করিয়া আবার পড়িলাম—একটি স্তম্ভে লিখিত—"ইন্দিরা রায়, মৃত্যু ২৮শে অগ্রহায়ণ, ফুলশয্যার রাত্রি।" তাহার পাশের স্তম্ভটিতে লিখিত—"ফণীন্দ্র রায়, মৃত্যু ২৮শে অগ্রহায়ণ ফুলশয্যার রাত্রি।"

আমি বসিয়া পড়িলাম। আমার স্বপ্নে লেখার থিওরী ধ্বসিয়া পড়িয়া মনটা আবার অভাবিত সমস্যার সন্মুখে গিয়া পড়িল!

স্টেশনমাষ্টারবাবু আমাকে বসিতে দেখিয়া বসিলেন, বলিলেন—ফুলশয্যার রাত্রে বরবধূর একত্র মৃত্যু দেখে বিস্মিত হয়েছেন নিশ্চয় ?

আমার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—হাঁ।

তবে শুনুন—বলিয়া তিনি আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—যে বাড়ীটায় আপনি আছেন, সেখানেই এই ব্যাপার ঘটেছিল অনেক দিন আগে। এখানকার পুরাণো লোকদের মুখে এ কাহিনী শুনেছি। আরও শুনেছি যে, এ বাড়ীটা ফণীন্দ্র রায়েরই ছিল। তার মৃত্যুর পরে সেই পাদ্রীসাহেব কিনে নিয়েছে।

—মৃত্যুর কারণ কিছু শুনেছেন ?

তিনি বলিলেন, অনেকে অনেক কথা বলে—কেউ বলে, নূতন বৌয়ের গহনার লোভে ডাকাতে এসে মেরে গহনাপত্র লুট করে নিয়ে গেছে। আবার কেউ বা বলে—ফণীন্দ্র রায় নিজেই বধূকে হত্যা ক'রে শেষে আত্মহত্যা করেছে! মেয়েটার স্বভাব-চরিত্র নাকি ভালো ছিল না!

শেষোক্ত মন্তব্য শুনিয়া অজ্ঞাতসারে আমার মুখ দিয়া বাহির হইল—না, না, তা হ'তে পারে না।

স্টেশনমাষ্টারবাবু শুধাইলেন—কেন, আপনি কিছু শুনেছেন কি ?

—ওটা এমনি বললাম।

তিনি বলিলেন—তা বটে, আপনিই বা শুনবেন কোথাথেকে ? এসব অনেককাল আগেকার কথা।

তারপরে বলিলেন—চলুন ফেরা যাক। এখানে অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভল্লুক বের হয়।

দু'জনে ফিরিয়া চলিলাম। তিনি ইন্দিরার কাহিনী বিস্মৃত

হইয়া অন্যান্য তুচ্ছ কথা লইয়া পড়িলেন—কিন্তু সেদিকে আমার মন ছিল না। আমার মনের মধ্যে ইন্দিরার স্মৃতি একটি অলৌকিক শ্বেত ময়ূরীর মতো কলাপ বিস্তার করিয়া দিয়া ক্রমশঃ অন্য সব বিষয় আচ্ছন্ন করিয়া দিতে লাগিল। মনে হইল ইন্দিরাই আমাকে তাহার ট্র্যাজেডির সাক্ষী হইবার জন্য করুণ আহ্বান জানাইয়াছিল, আমি সরিতে চাহিলেও সরিতে দেয় নাই। তাহার মৃত্যুর সত্যটা আর একটা মানুষকে জানাইবার জন্যই এতকাল তাহার আত্মা যেন আকুলিবিকুলি করিতেছিল। এতদিন পরে হয়তো ইন্দিরা শান্তি পাইল। যখন বাসায় ফিরিলাম, শরতের নৈশ আকাশ ইন্দিরার অশ্রুজলে ছাইয়া গিয়াছে। কত অশ্রু নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, ইন্দিরার অশ্রু মুছিবার নয়, তারকাপুঞ্জের অমর ভাস্বরতায় চিরকাল তাহা জ্বলিতে থাকিবে।

কপালকুণ্ডলার দেশে

বিচিত্র কর্ম্মপ্রবাহ আমাকে কপালকুণ্ডলার দেশে টানিয়া আনিয়াছে। নবকুমারের মতো আমি রসুলপুরের নদীর মোহানা বাহিয়া আসি নাই বটে, তবে রসুলপুরের নদীর মোহনার ধারেই আসিয়া পড়িয়াছি। কয়েকশত বৎসর আগে এই অঞ্চলকে নবকুমার যেমন দেখিয়াছিল বা আশি বৎসব আগে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন দেখিয়াছিলেন, আমিও তেমনি দেখিলাম। কপালকুণ্ডলার দেশে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। আরও ভাল করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে একটা বালিয়াড়ির শিখরে চড়িলাম। অদূরে রসুলপুরের নদীটা দুই তটবাহু প্রসারিত করিয়া দিয়া সমুদ্রের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। এই নদী সমুদ্রের আলিঙ্গনে, কোথায় নদীর শেষ, আর কোথায় নদীর আরম্ভ বুঝিতে পারা যায় না। পারা গেলে কি মিলন অসম্পূর্ণ থাকিত না? যে-মিলনে দুইয়ের সীমা ঘুচিয়া না যায় সে তো জোড়া লাগামাত্র, মিলন নয়। এতদূর হইতে সমুদ্রেব আভাস মাত্র পাওয়া যায়, তার বেশী নয়। একটা কূলে আমি দাঁড়াইয়া আছি—আর একটা কূল নাই, কেবল সীমাহীন প্রসার—অভ্যস্ত চোখ না হইলে তাহাকে আকাশ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া চিনিতে পারিবে না। দূরে, ঐ সীমাহীনের মাঝ খানে একটা জায়গায় একটা রেখা মাঝে মাঝে কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। ওই বোধহয় তরঙ্গমালা। দূরত্ব এমন অপরিমিত যে তরঙ্গমালার গতি বুঝিবার উপায় নাই—মনে হয় তরঙ্গরেখা একই স্থানে কুঞ্চিত হইয়া আবার

মিলাইয়া যাইতেছে। চোখ দুটার দৃষ্টিকে পীড়ন করিয়া সমুদ্রে ইউরোপীয় জাতির অর্ণবপোত আবিষ্কারের চেষ্টা করিলাম—কিছুই দেখিতে পাইলাম না। নাঃ, নবকুমারের সময়ের পরে অনেক যুগ চলিয়া গিয়াছে—অর্ণবপোত এখন স্বল্পজলে আসিবে না। নদীর কূল হইতে আমি যেখানে দাঁড়াইয়া আছি—অনেকটা জায়গা, কিন্তু না আছে সেখানে ধানের ক্ষেত বা ক্ষেতের চিহ্ন, আবার না আছে বড় গাছগাছড়া, কেবল ইতস্ততঃ ছোট-খাটো ঝোপঝাড়। বুঝিতে কষ্ট হয় না যে বর্ষাকালে সমস্তটা ভরিয়া যায়, গুল্মগুলি ডুবিয়া নষ্ট হয়, জল সরিয়া গেলে আবার জন্মায়। ওদের জীবন ষান্মাসিক। আমি একটি বালিয়াড়ির চুড়ায় দাঁড়াইয়া আছি—আমার বামে বালিয়াড়ির উচু নীচু শৃঙ্খল অনাদ্যন্ত প্রবাহে চলিয়াছে—শুনিতে পাই সুবর্ণরেখা অবধি এমনি চলিয়াছে। আমি যেটির উপরে আছি সেটা এই গিরিশৃঙ্খলের শেষ চুড়া—তার পরেই নদী উপত্যকার সমতল মাঠ। ১৯৪২-এর প্রবল বন্যা ও ঝড়ে বালিয়াড়ির উচ্চতা অনেকটা নাকি হ্রাস পাইয়াছে, আবার অনেকগুলি একেবারেই নাকি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। আমার পিছনে, বালিয়াড়ির নীচেই উদ্ভিদ্ জগতের সীমানা। গাছের মধ্যে প্রধান এক রকম বন্য বাদাম আর ঝাউ গাছ। বোধ করি নবকুমার ক্ষুন্নিবৃত্তির আশায় এই বুনো ফলগুলিও খাইয়াছিল। নবকুমারের সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলো বুনো বাদাম পাড়িয়া আনিলাম। ফলগুলি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম কলিকাতার সৌখিন কফি হাউসে ভর্জিত আকারে লোকেরা এগুলি খায়। কিন্তু আবার আমার দুর্ভাগ্য। এখনো পাকে নাই। নবকুমার পৌষের শেষে

খাইয়াছিল—এখন চৈত্র মাস। পাকিতে আরও কিছু বিলম্ব। বুঝিলাম পাকা লেখকের হাতে পড়িলে ফল অকালে পাকিয়া ওঠে।

ঝাউয়ের শাখায় অবিরল হাহাকার চলিতেছে। এখানে সমুদ্রের আর কিছু না থাক সমুদ্রের হাওয়াটি আছে, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই তালে তালে দমকে দমকে তার গতি—ঝাউয়ের শাখা করুণায় শ্বসিয়া শ্বসিয়া ওঠে। ওই সমুদ্র যেন গৃহহারা কোন্ গুণী—মানব জগতের প্রান্তে মাটির উপরে দেহ এলাইয়া দিয়া ঝাউএর বাঁশীটি অধরে তুলিয়া লইয়াছে। অনাদি ব্যথার অনন্ত সুর ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে। ঝাউয়ের হাহাকার এমন করিয়া মন উদাস করিয়া দেয় কেন? তার কারণ আর কিছুই নয—ঝাউগাছ যেখানেই হোক তার আদি জন্মভূমি সমুদ্রতীরের স্মৃতি ভুলিতে পারে না। সমুদ্রতীরের স্মৃতিতে তার মনে আদিকালের বিরহ ব্যথা ধ্বনিত হইয়া ওঠে। সেই বিরহ শ্রোতার মনে চৈতন্যপূর্ব্ব বেদনা জাগ্রত করিয়া দেয়—সে হাহাকার করিয়া ওঠে, কিন্তু কারণ বুঝিতে পারে না। তাই তার এমন উদ্‌ভ্রান্তি।

সন্ধার ছায়া নামিতেছে। আকাশ এখনো সূক্ষ্ম ধূলিকণায় আচ্ছন্ন, কেমন যেন ঘোলাটে, কেবল পশ্চিমের সূর্য্যাস্তের স্থানটা রক্তাভ। বাতাস শীতল হইয়া উঠিতেছে—প্রকৃতির দৃশ্যপথের উপরে কে যেন কোমল তুলি বুলাইয়া দিয়াছে। ভাবিলাম সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইবার আগেই ফিরিতে হইবে, নতুবা নবকুমারের আশঙ্কা অপ্রত্যাশিত ভাবে সফল হইয়া "শিয়ালের" আবির্ভাব হইতে কতক্ষণ। এই বাঘের রাজ্যে নবকুমার শিয়ালের হাতে না পড়িয়া

কপালকুণ্ডলার হাতে পড়িয়াছিল—আমার যেমন কপাল আমার ভাগ্যে শৃগালোদয় ঘটিয়া যাইবে। আবার কাপালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াও বিচিত্র নয়। কাজেই মোটরখানার কাছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরিয়া গেলাম এবং গাড়ীতে উঠিয়া চাবি টিপিলাম। গাড়ীখানা বার তুই গোঁ গোঁ শব্দ করিল—কিন্তু চলিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। তখন গাড়ী হইতে নামিয়া হাতল ঘুরাইতে আরম্ভ করিলাম। হাতল ঘুরিল, হাত ব্যাথা হইল—কিন্তু গাড়ী কিছুতেই চলিল না। সর্ব্বনাশ! গাড়ীটা কিছুক্ষণ ঠেলিতে পারিলে চলিতে পারে—কিন্তু লোক কোথায়? মাঠের মধ্যে কোথাও জন-প্রাণী নাই। এখন? এ যে সত্য সত্যই নবকুমারের দশার সূচনা। এদিকে অন্ধকারের প্রথম পর্দ্দাখানা মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িয়াছে। ভাবিলাম এখন গাড়ীর চিন্তা রাখিয়া বাড়ীর চিন্তা করিবার সময়। নিকটে কোথাও লোকালয় থাকিলে সেখানে রাত্রি যাপন করিতে হইবে—গাড়ী এখানেই পড়িয়া থাক। "শিয়ালে" গাড়ীর আর কি করিবে? লোকালয়ের সন্ধানের বাহির হইলাম। বালির উচ্চ একটা শিরদাঁড়ার উপর দিয়া পথ—একটা বালিয়াড়ির অংশ—বোধ-হয় কোন প্রাচীন কালে একটা নদীস্রোত ভূমিকম্পের ঠেলায় উঁচু হইয়া শুকাইয়া গিয়াছিল—এখন তার চিহ্নরূপে শুষ্ক বালির নিশানা পড়িয়া আছে। বালুকাময় পথের একদিকে বাদাম, ঝাউ আর আম কাঠালের বন—আর এক দিকে ধূ ধূ মাঠ—সমুদ্রের প্রান্তে গিয়া মিশিয়াছে।

চলিতে লাগিলাম—পথ উঁচু নীচু, নির্জ্জন, মাথার উপরে ঝাউয়েব দীর্ঘশ্বাস, চারিদিকে হাওয়ার হাহাকার—অন্ধকার ক্রমে

ঘনতর হইতেছে। এমন সময়ে একটা বালিয়াড়ির আড়াল হইতে আলুলায়িতকুন্তলা, হরিণনয়না কোন তরুণীর মূর্ত্তি যদি জাগিয়া ওঠে, আর সে বারেক আমার দিকে তাকাইয়া যদি বলিয়া ওঠে, পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ, তবে মন্দ হয় না। কিন্তু নাঃ, এসব কাণ্ড কেবল কাব্যে উপন্যাসেই ঘটে। আমি তো সমুদ্রতটে বালিয়াড়িতে কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ পাইলাম না। কেহ কথনো শিব-মন্দিরে তিলোত্তমার দর্শন পাইয়াছে কি? তবে সংসারে কৎলুখাঁ ও বিদ্যাদিগ্‌গজ প্রচুর। তাহাদের সাক্ষাৎ যাচ্ঞা না করিলেও ঘটিয়া যায়। সর্ব্বনাশ। যদি কাপালিকটাই দেখা দেয়। দ্রুততর চলিতে লাগিলাম। আচ্ছা, আমি না হয় কল্পনা-লেশহীন নিরেট গদ্য, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যখন এখানে আসিয়াছিলেন তাহার চর্ম্ম-চক্ষুতেও কপালকুণ্ডলা তো পড়ে নাই। তবে তিনি নাকি কাপালিকের দেখা পাইয়াছিলেন। একটা রাত্রি নাকি তাঁহাকে এই অঞ্চলেই কাটাইতে হইয়াছিল। তাহারই প্রত্যক্ষ ফল নাকি কপালকুণ্ডলা কাব্য।

হাতে একটা টর্চ বাতি ছিল, এখন সেটা ঘন ঘন টিপিয়া পথ চলিতে হইতেছে। একবার টর্চের বিদ্যুত আলোয় পথের বাঁদিকে একটা উচু ভিটার মত চোখে পড়িল। কাছে গিয়া দেখিলাম—একটা চারচালা ঘরই বটে। কিন্তু ঘরটা তাহার চতুর্থ অবস্থায় আসিয়া পৌছাইয়াছে। চারিদিক ঘুরিয়া বুঝিলাম—এক কালে গৃহটী সুনির্ম্মিত ছিল। মেঝে এখনো পাকা, তবে অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকায় ভাঙিয়া চুরিয়া গিয়াছে। দরজা জানলা খসিয়া পড়ার মতো—কাছেই আর দুটি ভিটা—সেখানে ভূতপূর্ব্ব ঘরের

চিহ্ন মাত্রও নাই। ভাবিলাম এই নির্জনে ঘরগুলি আসিল কোথা হইতে? ভাবে মনে হইল—ডাকবাংলা জাতীয় কোন আশ্রয় হইবে। খুব সম্ভব বিয়াল্লিশের বন্যায় এমন দুর্দ্দশা হইয়াছে। তার-পরে মেরামতের কথা আর কাহারো মনে পড়ে নাই।

ঘরটির ভিতরে ঢুকিলাম। একখানা জীর্ণ খাটের কঙ্কাল ছাড়া আর কোন আসবাব নাই। ভাবিলাম এখানেই রাতটা কাটাইয়া দেওয়া যাক। চোর ডাকাত আসিবে না, তাহারা যতই চতুর হোক এখানে জনাগম কল্পনা করিতে পারিবে না। আর "শিয়াল!" দরজার দিকে তাকাইলাম। কোনরূপে ভেজান চলে মাত্র—অর্গল বলিয়া কিছুই নাই। শিয়াল কখনো ঘরে ঢুকিয়া লোক ধরে না বলিয়া মনকে সান্তনা দিলাম। কাজেই দরজা ভেজাইয়া দিয়া শূন্য চৌকির উপর শুইয়া পড়িলাম। একটু নড়িলেই খাটের কঙ্কাল মড় মড় করিয়া আপত্তি জানায়। ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, ঘুম আসিতে বিলম্ব হইল না। একবার মনে হইল—হয়তো এই ঘরটিতে বঙ্কিমচন্দ্র অনেককাল পূর্ব্বে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। মনে মনে হাসি পাইল। বঙ্কিমচন্দ্রের শূন্য সাহিত্যসিংহাসনে বসিবার সুযোগ পাইলাম না—কিন্তু তাঁহার শূন্য খট্টার আজ আমি একমাত্র উত্তরাধিকারী অন্ততঃ একটি রাত্রির জন্য। আর কেহ তাহাতে ভাগ বসাইতে আসিবে না আশা করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম।

হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল, খাটখানা মড় মড শব্দ করিয়া উঠিল। অপরিচিত স্থানে সুনিদ্রা হয় না। ঘুম ভাঙিয়া প্রথমে ঠাহর হইল না কোথায় আছি। বিদ্যুতের বাতি টিপিয়া চারিদিক দেখিয়া

সম্যক্ অবস্থা বুঝিতে পারিলাম। তাই তো! জনশূন্য মাঠের মধ্যে ভাঙা একখানা ঘরে একাকী পড়িয়া আছি। দরজা ভেজাইয়া দিয়াছিলাম, খুলিয়া গিয়াছে। যে-বাতাস! বাতাস যেন ঝড়ের বেগ ও গর্জ্জন পাইয়াছে—ঝাউয়ের শাখায় শাখায় কি পাগলামি চলিতেছে! আর বাতাসের উত্তাল উন্মত্ততার পটভূমিতে আরও একটা দূরশ্রুত চাপা হুঙ্কারের মতো কি যেন ধ্বনি! দিনের বেলায় তো শুনি নাই। একটু স্থির হইয়া ভাবিতেই মনে হইল—খুব সম্ভবতঃ সমুদ্রের গর্জ্জন। ঠিক, তাহা ছাড়া আর কি হইবে? শয্যাত্যাগ করিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। পশ্চিম দিগন্তে ম্লান চন্দ্র অস্ত যাইবার আয়োজন করিতেছে। সেই আবছায়া আলো অন্ধকারে সমস্ত দৃশ্যপট কালি-ঢালিয়া পড়া একখানা ছবির মতো অস্পষ্ট। বাতাসের গর্জ্জন, ঝাউয়ের শাখার মাতামাতি, দূরশ্রুত সেই বিরামহীন ভৈরবধ্বনি। সমস্ত প্রকৃতি যেন এক ভৈরবীচক্রে অবাঞ্ছিতের মতো উপস্থিত। অননুভূতপূর্ব্ব একভাবে আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে কি ভয়? ভয়ের মূলে এক নির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা থাকে—কিন্তু এই নূতন অনুভূতির মূলে তেমন কোন নির্দ্দিষ্ট ভাব নাই। জনপদবাসী মানুষ জনপদের বাহিরে আসিয়া পড়িলে বোধ করি এইরূপ অনুভব করিয়া থাকে। ঘড়িতে মাত্র বারোটা। জাগিয়া থাকা নিরর্থক মনে করিয়া আবার আসিয়া শুইলাম। বার-দুই এপাশ ওপাশ করিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

হঠাৎ যেন মনে হইল কে যেন ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে! চোর ডাকাত নাকি? এখানে আসিতে যাইবে কেন? ভাবিলাম একবার লোকটার চেহারা দেখিতে পাইলে হইত, কিন্তু উঠিতে

সাহস করিলাম না, নিদ্রিতের মতো পড়িয়া রহিলাম। দরজার ফাঁক দিয়া একটুখানি আবছা আলো ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। অস্তমান চাঁদের আলো নাকি? কিন্তু চাঁদটা নিশ্চয় ডুবিয়া গিয়াছে। আমিতো অনেকটা সময় ঘুমাইয়াছি। লোকটা ঘরের মধ্যে কি যেন সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। একবার সে দরজার অবকাশ ও আমার দৃষ্টির মাঝ খানে আসিয়া দাঁড়াইল। না দেখিয়া পারিলাম না—কিন্তু না দেখিলেই বুঝি ভালো ছিল। দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ, দৃঢ়-শরীর, মাথায় জটা! আবার সে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। পাশ ফিরিলে দেখা যায় কিন্তু নড়িতে সাহস হইল না। কিন্তু ভূত না মানুষ? যেই হোক এখানে কেন? কি খুঁজিতেছে! ভূত বা মানুষ যে-ই হোক আমাকে তো দেখিতে পাইবার কথা! ও কি দেখিতে পায় নাই? না, দেখিয়াও গ্রাহ্য করিতেছে না? কিম্বা সবই হয়তো মিথ্যা—আমি তো স্বপ্ন দেখিতেছি না? চোখে হাত দিয়া দেখিলাম চোখ-খোলা, চিমটি কাটিয়া দেখিলাম বেদনা বোধ হইতেছে। তবে লোকটা বাস্তব। কিন্তু ও কে? এবং এখানে কেন? শুধাইব? সর্ব্বনাশ! নড়িবার সাহস অবধি নাই।

এবারে লোকটা বৃথা সন্ধান ছাড়িয়া দিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং কথা বলিল—আমি সে কথা শুনিতে পাইলাম। শুনিতে পাইলাম বলিতেছি কিন্তু সে যেন কানে শোনা নয়; তাহার কথাগুলি যেন উপলব্ধি হইতে লাগিল। লোকটা বলিতেছিল—নাঃ লোকটাকে কি বলিলাম আর কি লিখিল। আমি বলিলাম আমার সাধনামার্গের গূঢ় রহস্য—লিখিয়া বসিল একটা গল্প!

এবারে বুঝিলাম হয় আমি স্বপ্ন দেখিতেছি নয় লোকটা ভূত।

কারণ একমাত্র স্বপ্নের কথাই কানে না শুনিয়াও বুঝিতে পারা যায়—আর কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম—যে সাধারণতঃ মানুষ যেমন ভূতকে দেখিতে পায়না, ভূতের পক্ষেও মানুষ তেমনি অদৃশ্য। তবে মানুষ ও ভূতের ইচ্ছায় ইচ্ছায় ঠোকাঠুকি হইয়া গেলে তাহারা পরস্পরকে দেখিতে পায়—মানুষ ও ভূতের জ্ঞানের মাধ্যম ইন্দ্রিয় নয়, ইচ্ছাশক্তি।

আবার যেন শুনিতে লাগিলাম—আমি ভাবিয়াছিলাম লোকটার বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল। কত লোককেই তো বুঝাইয়াছি—কিন্তু তাহার মতো কেহ বুঝিতে পারে নাই। বলিয়াছিল লিখিবে। আমি বলিলাম —লিখিও, তুমি পারিবে, আর এসব গূঢ় কথা সকলকে জানাইবার প্রয়োজন আছে। ভাবিলাম একবাব সেই ঘরটাতে খুঁজিয়া দেখি —যদি পাণ্ডুলিপিখানা পাই দগ্ধ করিয়া ফেলিব।

থামিল। এবারে সে দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল এবং দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না ; বঙ্কিম, তুমি যে কি সুযোগ নষ্ট করিলে তাহা তুমি জানোনা!

এতক্ষণে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল—যে আমি স্বপ্ন দেখিতেছি —কপালকুণ্ডলার কাপালিকের স্বপ্ন। আমার বঙ্কিমপ্রীতি আর আর কপালকুণ্ডলার দেশ, তার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে এই ঘরে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস, সবশুদ্ধ জড়াইয়া দিয়া একটা দুঃস্বপ্নের সৃষ্টি করিয়াছে। ততক্ষণে লোকটা বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে—অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর আলোয় দেখিতে পাইলাম —হাঁ, কপালকুণ্ডলার কাপালিকের মতো চেহারাটা! গলায় রুদ্রাক্ষের মালা এবং হাতে প্রকাণ্ড একখানা চিমটা। লোকটা হন্‌হন্

করিয়া নামিয়া অগ্নিশিখার দিকে চলিতে লাগিল। তাই বটে, —অদূরে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে—তাহারই আলো ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

এবারে বিশ্বাস পাকা হইল যে এতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখিতে-ছিলাম—এবারে স্বপ্ন মিলাইয়া গেল।

যখন ঘুম ভাঙিল তখন বেলা অনেকটা হইয়াছে। লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলাম। প্রথমেই স্বপ্নবৃত্তান্ত মনে পড়িল। ভাবিলাম এমন স্বপ্নও মানুষে দেখে! আবার ভাবিলাম স্বপ্নই যদি দেখিতে হয় তবে স্বপ্নদর্শনের এমন দেশ কাল পাত্র আর কোথায় পাইব। বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম—অগ্নিকুণ্ডের চিহ্নমাত্র কোথাও দেখা যাইতেছে না। ভাবিলাম স্বপ্নের আবার চিহ্ন কি?

পায়ের জুতা জোড়াব ফিতা বাঁধিবার জন্য মুখ নীচু করিবার সময় চমকিয়া উঠিলাম—এ কি! বারান্দায় এ কাহার পদচিহ্ন? আমার হইতেই পারেনা, আমার পায়ে সর্ব্বদা জুতা ছিল। এ খালি পায়ের চিহ্ন, তাহা ছাড়া এত বড় পা আমার নয়! কাদাবালুমাথা মস্ত একখানা পায়ের ছাপ! স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের দেহায়তনের অনুপাতিক ছাপ। তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া পালাইবার উদ্দেশ্যে ভিতরে টিপ-বাতি আনিতে গেলাম—মেঝেতে আর একটি ছাপ! তবে তো স্বপ্ন নয়! স্বপ্নমূর্ত্তির কি ছাপ পড়ে? নিশ্চয়ই ঘরে কেহ ঢুকিয়া-ছিল। কে সে? কেন ঢুকিয়াছিল? আমাকে দেখিতে পায় নাই? না, দেখিয়াও গ্রাহ্য করে নাই? কিন্তু সে যে স্বপ্নমাত্র নয় সে কথা নিশ্চিত! আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে আমার সাহস হইল না। বারান্দা হইতে নামিয়া পথের দিকে দ্রুত যাত্রা

করিলাম—পিছনের দিকে ফিরিয়া তাকাইবার সাহসটুকুও হইল না।

কিছুদূর যাইতেই একটি লোককে দেখিতে পাইলাম—তাহাকে আমার মোটর বিগড়ানোর সংবাদ জানাইয়া বলিলাম যে একটু সাহায্য করিতে হইবে। সে রাজি হইয়া শুধাইল—কিন্তু কাল সারা রাত্রি ছিলেন কোথায় ?

আমি বলিলাম—কেন ওই ভাঙা ঘরখানায় !

সে বিস্মিত হইয়া বলিল—ঘর ? এখানে ঘর আসিল কোথা হইতে ?

—কেন ওই যে ! বলিয়া আমি ফিরিয়াই ইঙ্গিত করিয়া নিজেই অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম। ঘর কোথায় ? একখানা শূন্য ভিটা পড়িয়া আছে মাত্র।

লোকটা কি ভাবিল জানি না। হয়তো ভাবিল আমি তাহাকে লইয়া ঠাট্টা করিতেছি, হয়তো ভাবিল আমি মাতাল। আরো কত কি ভাবিল কে জানে। অধিক ভাবিবার সময় না দিয়া তাহাকে লইয়া আমি মোটরখানার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিন্তু আমার ভাবনার অবসান ঘটিল না। আজিও ঘটে নাই ? কি দেখিলাম ? কোথায় ছিলাম ? এ সমস্যার সমাধান আজিও খুঁজিয়া পাই নাই।

কালো পাখী

মিনু হঠাৎ ছুটিতে ছুটিতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—দেখো বাবা কি পেয়েছি!

মুখ তুলিয়া তাকাইয়া দেখি তাহার হাতে ছোট একটি কালো পাখী, বলিলাম—কোথায় পেলি?

মিনু একবার পাখাটির দিকে, একবার আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—ধরেছি?

—ধরেছি? সে কিরে! কার পাখী ধরতে গেলি।

মিনুর কেমন যেন সন্দেহ হইল পাখীর স্বত্ব-স্বামীত্বে তাহার পিতার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাই সে বলিল—পাখী আবার কার?

এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—যাইবার সময়কার তাহার অর্দ্ধব্যক্ত বাক্য হইতে বুঝিতে পারিলাম যে একটি খাঁচা সংগ্রহ করিতে পারিলেই তাহার আশু সমস্যার সমাধান হয়।

কাজের চাপে মিনুর পাখীর কথা আমার মন হইতে মুছিয়া গেল।

বিকালবেলা আমি বাড়ী পৌঁছিলেই মিনু ছুটিয়া আমার কাছে আসে, তা সে যেখানে—যে অবস্থাতেই থাক না কেন! কিন্তু আজ বাড়ী আসিলাম—মিনু আসিল না। আমি বিস্মিত হইয়া মিনুর মাকে শুধাইলাম, মিনু কোথায়?

মিনুর মা হাসিয়া বলিল—মেয়ের কি আর অন্য দিকে হুঁস আছে?

পাখী নিয়ে পড়ে আছে। তখন আমার সকাল বেলার কথা মনে পড়িল, বলিলাম, চলো, মিনুর পাখী দেখে আসি।

দু'জনে তেতালার ছাদে উঠিয়া দেখিতে পাইলাম যে একান্তে মিনু বসিয়া আছে, সম্মুখে তাহার ছোট একটি লোহার খাঁচা, খাচার মধ্যে সেই কালো ছোট পাখীটি। আমাকে দেখিয়া মিনু ছুটিয়া আসিয়া কোলে চড়িল, বলিল, বাবা পাখীটা কেমন পোষ মেনে গিয়েছে?

তারপরে শুধাইল—বাবা ওটা কি পাখী?

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া ভালো করিয়া পাখীটির দিকে তাকাইলাম—সত্যই তো কি পাখী? কোকিলের মত মিশ কালো অথচ চোখ দুইটা লাল নয়, ময়নার গলার মতো একটা কণ্ঠি আছে তবে রংটা হলদে নয়—লাল, আর আকারে কোকিল ও ময়না, দুইয়ের চেয়েই ছোট, একটা বুলবুলের চেয়ে বড় হইবে না। সত্যই এমন পাখী কখনো দেখি নাই, জানিলাম এ পাহাড়ে দেশে কত অজানা জাতের পাখী আছে—ক'টার আর নাম জানি।

মিনু আবার প্রশ্ন করিল—বাবা কি পাখী? বলিলাম—ওটা পাহাড়ী ময়না।

মিনু খুশী হইয়া বলিল—ঠিক, ঠিক, ময়নাই বটে!

মিনু কোল হইতে নামিয়া ময়নার পরিচর্য্যায় লাগিল, আমি অফিসের পোষাক ছাড়িতে গেলাম।

ইহার পর হইতে মিনুর হাব ভাবে পরিবর্ত্তন দেখা দিল। প্রথম, আগের মতো সে আমার কাছে ঘন ঘন আসে না, ডাকিলে তবে আসে, আসিলেও বেশিক্ষণ থাকে না, পাখীর কাছে যাই বলিয়া চলিয়া যায়। দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন মিনুর মুখে কথার ঝরণা বহিত। এখন তার কথা বলা

কমিয়া গেল। সে চুপ করিয়া আছে কেন শুধাইলে ওষ্ঠাধরে তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া বলিত, চুপ। পাখীটা কি কথা বলে? বেশি কথা বল্‌লে পাখী রাগ করবে?

তাহাদের কথা শুনিয়া এতদিনে আমার খেয়াল হইল—সত্যই তো পাখীটাকে কখনো ডাকিতে শুনি নাই তো! মিন্নুর মাকে শুধাইলে বলিল—সেও কখনো পাখীটাকে ডাকিতে শোনে নাই। তৃতীয় পরিবর্ত্তন, মিন্নু সঙ্গীদের সহচর্য্যা পরিত্যাগ করিল, আর সে খেলিতে যাইতে চাহে না, জোর করিয়া পাঠাইয়া দিলেও তখনি ফিরিয়া আসে, ফিরিয়া আসিয়া পাখীর খাঁচার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, ছাতু ছোলা ফড়িং—যাহা হাতের কাছে প্রস্তুত থাকে—খাইতে দেয়।

অবশ্য মিন্নুর এ সব পরিবর্ত্তন তখন তখনই বুঝিতে পারি নাই, অনেক পরে বুঝিয়াছি—হায় যদি আগে বুঝিতে পারিতাম!

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাংলোর বারান্দায় বসিয়া আছি। চারিদিকে বড় বড় পাহাড়ের মাথাগুলা কালো কালো ছায়া ফেলিয়াছে, নীচের সুগভীর উপত্যকায় মর্ম্মরহীন অরণ্য পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মতো জমাট, আকাশের মাঝখানে এক ফোঁটা চোখের জলের মতো প্রকাণ্ড একটা তারা, সবসুদ্ধ মিলিয়া সদ্যমৃতের কক্ষের নীরবতা রচনা করিয়াছে। এমন সময়ে দেখিলাম মিন্নু পা টিপিয়া বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার এ সময়ে এখানে আসিবার কথা নয়। আমি শুধাইলাম—মিন্নু এখানে কেনরে? সে চমকিযা উঠিয়া বলিল—কিছু না বাবা।

বেশ বুঝিলাম সে কোন একটা বিষয় গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। সে বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়া হাতটা উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিল—একটা পাখী উড়িয়া গেল।

আমি বলিলাম—মিন্নু পাখীটা ছেড়ে দিলি নাকি ?

সে বলিল—আবার ফিরে আসবে, বাবা।

তখন তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কথায় কথায় অনেক বিষয় আদায় করিয়া লইলাম। মিন্নু বলিল যে, সে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পাখীটা ছেড়ে দেয়, সকালবেলা ফিরে এসে খাঁচায় ঢোকে—ভারি পোষ-মানা পাখী কি না! আমি শুধালাম—ছেড়ে দিস্ কেন ? মিন্নু বলিল—ও দিনের বেলায় কিছু খায় না। আমি বলিলাম—তবে যে খেতে দিস্! সে বলিল—খেতে দিই কিন্তু ও খায় না! একদিন স্বপ্ন দেখলাম যে পাখীটা বলছে, আমাকে সন্ধ্যা বেলা ছেড়ে দিও, সারা রাত ঘুরে খেয়ে সকাল বেলায় ফিরে আসবো। সেই থেকে সন্ধ্যা বেলা ছেড়ে দিই—লক্ষ্মী পাখী ভোর বেলা ঠিক ফিরে আসে। বুঝিলাম স্বপ্নের কথা বাজে, তবে পোষ মানিলে পাখী খাঁচায় ফিরিয়া আসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যাইহোক, মিন্নু যে এর আগেও পাখীটা ছাড়িয়া দিত তাহা আমি বা তার মা কেহই লক্ষ্য করি নাই। আমরা সংসারের বড় কাজেই ব্যস্ত, মিন্নুর পাখীর তত্ত্ব লইবার অবসর আমাদের কোথায় ? রাত্রিটা পাখীর ও মিন্নুর আচরণ সম্বন্ধে মনের মধ্যে তোলপাড় করিল—সকাল হইতেই অন্যান্য চিন্তার স্রোতে সব তলাইয়া গেল।

কিছুদিন পরে মিন্নুর মামা বেড়াইতে আসিল। পাহাড়ী অঞ্চলে তাহার এই প্রথম আগমন। সে মিন্নুকে দেখিবামাত্র চমকিয়া উঠিয়া বলিল—মিন্নু তোর শরীর এত খারাপ হয়ে গেল কেনরে ?

মিন্নু কি আর বলিবে।

তাহার মামা আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—

তোমরা কি লক্ষ্য করনি ?

অশরীরী

সত্যই আমরা লক্ষ্য করি নাই। প্রতিদিনের দর্শন নূতন দর্শনের বাধা। এবারে লক্ষ্য করিলাম মিনুর শরীর খারাপ হইয়াছে বই কি! সে কৃশ হইয়া পড়িয়াছে, মুখ চোখ ফ্যাকাসে, আর উজ্জ্বলতর চোখ দুইটি প্রখরতর দীপ্তিতে তাহার কৃশতাকে আরও প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। মিনুর মামা ডাক্তার আনিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিল। তার পর কিছুদিন পরে একদিন রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি মিনু শয্যাতে নাই; বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। তাহার মাকে আর জাগাইলাম না।—দরজার কাছে গিয়া দেখি দরজা ভেজানো বটে তবে অনর্গল। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম বারান্দার একটি খুঁটি ধরিয়া মিনু 'কালো আকাশের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে—সম্মুখে কালো পাহাড় ও বনের ঝাপসা ছায়া। একেবারে গিয়া তাহাকে ধরিলাম, সে চমকিয়া উঠিল, বলিলাম—এখানে কিরে?

সে বলিল,—গোল ক'রোনা, তাহলে ও আর ফিরে আসবে না!

—কে?

—পাখীটা।

আমি বলিলাম, না আসে আসুক, তুই শুতে চল্।

তার পরে বলিলাম—তুই যে একা এসেছিস্ তোর ভয় করে না?

সে বলিল, ভয় কিসের? ও বলেছে পাহাড়ে বনে ভয়ের কোন কারণ নেই, ঘরেই যত ভয়!

আমি বলিলাম, তোর মাথা! যত সব বাজে বকুনি! এমন করলে ও পাখী ছেড়ে দেবো।

মিন্নু বলিল—আমি ছাড়লেও আমাকে ও ছাড়বেনা, খুব পোষ মেনেছে কিনা ! আমাকে কত কথা শোনায় ?

আমি ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলাম, পাখী আবার কথা শোনায় ? একটা শিষও তো দেয় না ।

মিন্নু বলিল—মুখে বলে না বটে, কিন্তু স্বপ্নে আমি ওকে দেখি কি না—তখন সব জানতে পাই ।

মিন্নুকে ঘরে টানিয়া আনিলাম। তারপর হইতে দরজায় তালা লাগাইয়া শুইতাম। সে আর বাহির হইতে পারিত না বটে কিন্তু তাহার শরীরও যে কৃশতর হইতেই থাকিল তাহা আমরা লক্ষ্য করিলাম না।

একদিন রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি মিন্নু বিছানায় জাগিয়া বসিয়া আছে। বলিলাম, মিন্নু ঘুমোস নি ! জেগে কেন রে ?

সে বলিল—বাবা, দরজাটা খুলে দাও না ! পাখীটা আসতে পারছে না।

আমি বলিলাম, পাখী আবার কোথায় দেখ্‌লি ?

সে বলিল, কেন ওই যে জানালার ওধারে—এই বলিয়া কাঁচের একটা জানালা দেখাইয়া দিল। আমি উঁকি মারিয়া দেখিলাম—কোথাও কিছু নাই। বাহিরে অন্ধকারময় শূন্যতা। তারপরে মিন্নুকে কাছে টানিয়া লইয়া দুইজনে শুইয়া পড়িলাম।

তারপর দিন মিন্নুর মাকে গত রাত্রির ও সেদিনকার রাত্রির ঘটনা বলিলাম। সে রাগিয়া মিন্নুকে এক চড় মারিল এবং পোড়ারমুখো পাখীটাকে বিদায় করছি বলিয়া খাঁচা হইতে বাহির করিয়া

পাখীটাকে ছাড়িয়া দিল। মিন্থু বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন পাহাড়ে বর্ষা নামিয়াছে। অসাবধানে মিন্থুর ঠাণ্ডা লাগিল এবং দিনকয়েকের মধ্যেই জ্বর লইয়া সে শয্যাশায়ী হইল। ডাক্তার আসিল, তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিল, শরীর অনেকদিন থেকে খারাপ হচ্ছে, রোগ কঠিন বলেই মনে হচ্ছে। তারপরে আমাদিগকে সান্তনা দিয়া বলিল, চেষ্টার ক্রটি করবো না।

মিন্থুর অসুখ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। রাত্রিবেলা সে ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিয়া বলিত, বাবা দরজাটা খুলে দাও না, পাখীটা আসতে পারছে না।

আমরা কখনো পাখী দেখিতে পাইতাম না— তাহাকে সান্তনা দিয়া ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা করিতাম। দিনের বেলায় সে বড় একটা কথা বলিত না।

ডাক্তার চেষ্টার ক্রটি করিল না, আমরাও যথাসাধ্য করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। মিন্থু একদিন আমাদের ঘর শূন্য করিয়া চলিয়া গেল।

বাড়ীতে আর মন টেকে না, এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াই, এই পাহাড়ী সহরে প্রতিবেশীর বাড়ী কাছে নয়, বড় যাওয়া হইয়া ওঠে না। একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে মিঃ রায়ের বাড়ীতে গেলাম। মিঃ রায় বলিলেন, আপনার সর্ব্বনাশের কথা শুনেছি, কিন্তু যেতে পারিনি। ক'দিন থেকে আমার ছোট মেয়েটি অসুস্থ।

মিঃ রায়ের ছোট মেয়েটির নাম ঝুমঝুমি, প্রায় মিন্থুর বয়সী।

মাঝে মাঝে মিন্নুর সঙ্গে খেলিতে আমাদের বাড়ীতে যাইত। রোগীর ঘরে গিয়া দেখিলাম ঝুমঝুমি অত্যন্ত রোগা হইয়া পড়িয়াছে, নিস্তেজের মতো ঘুমাইতেছে। মিঃ রায় বলিলেন, ডাক্তারে দেখছে, বলছে চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। ভাবিলাম ডাক্তারের ত্রুটিতে রোগী কবে মরিয়াছে? ঘর হইতে দুইজনে বাহির হইয়া পিছনের বারান্দায় গিয়াই আমি চমকাইয়া উঠিলাম, দেখিলাম বারান্দার কাছে একটা খাঁচা—আর তার মধ্যে সেই পাখীটা, কিম্বা অবিকল সেই রকম কালো একটা পাখী!

আমি শুধাইলাম, এ পাখীটা পেলেন কোথায়?

রায় বলিলেন,—কি জানি ঝুমঝুমি কোথা থেকে ধরে এনেছে।

বুকের মধ্যে আমার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, পাখীটা আমি ছেড়ে দিই।

রায় বলিলেন, কেন, ওটা যে ঝুমঝুমির খুব আদরের।

আমি বলিলাম, তাহোক। বলা উচিত ছিল সেইজন্যেই ছেড়ে দিতে চাই।

আমি রায়ের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া পাখীটা বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিলাম। ভাবিলাম ওকে ছাড়িয়া দিলেই কি ও ছাড়িবে?

মিঃ রায় আমার অদ্ভুত আচরণের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না আমিও, বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম না। বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম।

পথে কেবলি মনে হইতে লাগিল, কালো পাখীটার সঙ্গে কোনো অজ্ঞেয়-সূত্রে নিশ্চয় মিন্নুর মৃত্যু জড়িত। ভাবিলাম, আমার যা হইবার তো হইয়াছে এবারে মিঃ রায়ের ভাগ্যে না জানি কি ঘটে।

তারপরে অনেকদিন আর রায়ের বাড়ী যাইতে পারি নাই। হঠাৎ একদিন ম্যালের নিকটে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ। তাঁহার মুখ দেখিয়াই াব বুঝিতে পারিলাম। তিনি আসিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন। দুইজনে চুপ করিয়া অনেকক্ষণ একটি বেঞ্চিব উপরে বসিয়া রহিলাম।

মিঃ রায় বলিলেন আপনি তো পাখীটা ছেড়ে দিয়ে এলেন কিন্তু সেটা আমাদের বাড়ী ছাড়েনি; দিনের বেলা রোগীর ঘরের কাছে এসে উড়ে উড়ে বেড়াতো।

আমি শুধাইলাম, আর রাতের বেলা?

রায় চমকিয়া উঠিয়া শুধাইলেন, রাতের বেলায় যে কিছু হোত তা জানলেন কি করে?

আমি আমাদের অভিজ্ঞতা চাপিয়া গিয়া বলিলাম, না এমনি জিজ্ঞেস করছি।

রায় বলিলেন, ঝুমঝুমি রাতের বেলা চীৎকার ক'রে উঠতো—বাবা, দরজাটা খুলে দাও, পাখীটা আসতে পারছেনা। কথনো কিছু দেখতে পাই নি। ডাক্তারে বলেছিল ওটা দুর্ব্বল মস্তিষ্কের বিকৃতি।

তারপরে রায় বলিলেন, সব চেয়ে আশ্চর্য্যের এই যে, সব শেষ হয়ে যাবার পর থেকে পাখীটাকে আর দেখা যায় নি।

দুইজনে বিমূঢ়ের মতো বসিয়া রহিলাম। আমার মনের মধ্যে একটা কালো সন্দেহ ক্রমে মূর্ত্তি ধরিয়া জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল। আর বাহিরের আকাশেও তখন অন্ধকার নিরেট হইয়া উঠিয়াছে। বড় বড় পাহাড়ের চূড়াগুলি পৃথিবীর গায়ে কালো কালো ছায়ার মোটা তুলি বুলাইয়া দিয়াছে, উপত্যকা অরণ্যে চাপা ওষ্ঠাধরের স্বেচ্ছাকৃত

নীরবতা, আকাশের তারাগুলিতে কেমন নিষ্পলক জ্যোতি, বায়ুস্তর নিস্তরঙ্গ! ইহারা জানে সব, কেবল বলিবে না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মানুষের জীবনমৃত্যু যে রহস্যসূত্রে গ্রথিত, এই পর্ব্বত, অরণ্য, এই গ্রহ নক্ষত্র ও তিমিরময়ী রাত্রি—তাদের সমস্ত হিসাব নিকাশ জানে, কেবল প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। তাহাদের কৃপণ মুষ্টি হইতে সে রহস্য ছিনাইয়া লই এমন সাধ্য আমার নাই। তাই রুদ্ধ রহস্যদ্বারের দিকে তাকাইয়া নিতান্ত মূঢ়ের মতো বসিয়া রহিলাম।

নিশীথিনী

শিংভূম জেলা আদিম পাহাড় ও অরণ্যে পরিপূর্ণ। উত্তরাপথ যখন মহাসমুদ্রের অংশ ছিল, প্রাগৈতিহাসিক জলচর জীবেরা যখন অতিকায়িক বপু লইয়া সেই বিশাল জলময় মরুতে সন্তরণ করিত শিংভূমের ভূখণ্ডে তখন প্রাচীন শ্বাপদ ও প্রাচীন উদ্ভিদ দেখা দিয়াছে। মানবহীন নির্জ্জনতায় তাহারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত, পাহাড়ের গুহায় গুহায় তাহাদের আবাস ছিল, প্রাচীন সুবর্ণরেখার বারি পান করিয়া তাহারা তৃষ্ণা মিটাইত। সুবর্ণরেখা গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্রের তুলনায় কৌলিন্যে দীন হইলেও অস্তিত্বের দলিল তাহার অনেক বেশি পাকা।

শিংভূমের পাহাড় পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের আত্মীয় নয়, তাহাদের সগোত্রত্ব বিন্ধ্যপর্ব্বতের সহিত। এ সব পাহাড় বিন্ধ্যপর্ব্বতের দূরাতিদূর জ্ঞাতিবন্ধু। এখানকার অরণ্যমালাও প্রাচীন। তাহাদের শাখা-প্রশাখায় যে বাণী মর্ম্মরিত হইয়া ওঠে--তাহার ভাষা হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের বনস্পতিদের অজ্ঞাত। হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গয়র প্রভৃতি যে-সব শ্বাপদ এখানে বাস করে--অরণ্যের তুলনায় তাহারা এতই অর্ব্বাচীন যে অরণ্য তাহাদের প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র করে না। এখানকার আদিম অরণ্য ও পর্ব্বত চিরস্থায়ী রাত্রির মতো শিংভূমের অনেকটা স্থান জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে—সেই রাত্রির বুকে দুঃস্বপ্নের মতো শ্বাপদের দল ঘুরিয়া বেড়ায়—স্বপ্নের গোঙানির মতো তাহাদের গর্জ্জন নিস্তব্ধতাকে কণ্টকিত করিয়া তোলে। সেই অন্ধকারের

সীমানা ঘেঁষিয়া জমাট অন্ধকারে গড়া যাহাদের দেহ, সেই আদিবাসীর দল বাস করে—তাহারা আধুনিক শহর ও জনপদে বড় আসে না। শিংভুমের এমন অনেক অঞ্চল আছে সভ্য মানুষ এখনও সেখানে প্রবেশ করে নাই।

'আজ এমনই একটি স্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখিতে উদ্যত হইয়াছি।

নরসিংগড় শিংভূম জেলার একটি ছোট জায়গা, বেশি লোকের নজর এখানে পড়ে নাই, কিন্তু ভ্রমণরসিকেরা জানে শিংভুমের পার্ব্বত্য-অরণ্য অঞ্চলে প্রবেশের সিংহদ্বার এই ছোট জায়গাটি। এখানে একটি ডাকঘর আছে, আর আছে ফরেষ্টডিপার্টমেণ্টের একটি অফিস। এখানকার অফিসের ছোট সাহেব আমাদের একজন বন্ধু। তার নাম তরুণ গুপ্ত। সে অনেকবার লিখিয়াছে যে বেড়াইবার সখ থাকিলে আমরা যেন সেখানে যাই—সখ মিটাইয়া দিবে। কিন্তু কাজের চাপে যাওয়া হয় না। সেবারে বড়দিনের ছুটিতে প্রকাশ নামে এক বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া নরসিংগড়ে গিয়া পৌছিলাম। তখন সন্ধ্যাকাল। গুপ্ত ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। কাছেই তার সরকারী বাসা। গুপ্ত অবিবাহিত। কাজেই তিনজনে মিলিয়া নিঃসপত্ন অধিকারে রাত্রিটা বেশ কাটিল। আহারাদির পরে গুপ্ত বলিল—কাল তোমাদের নিয়ে বের হ'ব।

সে বলিল—আমার জিপ আছে, পাহাড়ে চলে বেড়াতে জিপের জুড়ি নেই। এমন সব জায়গায় যাবো—যার জুড়ি ভারতবর্ষে পাবে না, এক মধ্য আফ্রিকার অরণ্যে গেলে তার দোসর মিলবে।

রাত্রি ভোর হইলে বারান্দায় বাহির হইয়া উত্তর ও দক্ষিণ দুইদিকে দেখিয়া লইলাম। দক্ষিণ দিকে কিছু দূরে সুবর্ণরেখা নদী—তারপরে

মাঠ, মাঠের পরে পাহাড়ের শ্রেণী—ভাঁজে ভাঁজে পাহাড়, কতদুর আন্দাজ করা সম্ভব নয়। আর উত্তর দিকের পাহাড় আরও কাছে—সে পাহাড়ের শ্রেণীরও অন্ত নাই।

এমন সময় গুপ্ত বাহিরে আসিল, বলিল—পাহাড় দেখ্‌ছ ?

সে বলিল ঐ দক্ষিণ দিকের পাহাড় আমার এলাকার বাহিরে—ওগুলো ময়ুরভঞ্জের পাহাড়।

তারপরে বলিল—উত্তর দিকের পাহাড়ে আমরা যাবো।

আহারাদি দশটার মধ্যে সারিয়া লইয়া আমরা তিনজনে জিপযোগে উত্তর দিকে রওনা হইলাম। গুপ্ত জিপ চালাইতেছে। সন্ধ্যার আগেই ফিরিব স্থির হইয়াছিল, কাজেই সঙ্গে সামান্য কিছু খাদ্যমাত্র লওয়া হইল।

মাঠের পথ ধরিয়া জিপ ছুটিতে লাগিল—দুইদিকে মাঠে আম গাছ, মহুয়া গাছ, শাল, হর্তুকি, পিয়াশাল আরও কত কি গাছ, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, কোনটা বাঙালীদের, কোনটা বা আদিবাসীদের। সবে ধান-কেটে-নেওয়া নেড়া মাঠ থাকে থাকে উঠিয়া নামিয়া দিগন্তে মিশিয়াছে। জিপ অগ্রসর হইতেছে, পাহাড় ক্রমেই স্পষ্টতর হইতেছে। পাহাড়ের মাথায় ঘন অরণ্য। অবশেষে একটা পাহাড়ের গায়ে গাড়ি দাঁড়াইল।

আমি শুধালাম, কি নামতে হবে নাকি ?

গুপ্ত বলিল—না।

তারপরে তিনজনে তিনটি সিগারেট খাওয়া শেষ করিলে গাড়ী আবার ছাড়িল। এবার গাড়ী পাহাড়ে উঠিতেছে, পথ সঙ্কীর্ণ, কোন রকমে কাজ চালানো গোছের।

গুপ্ত বলিল—বর্ষাকালে পথগুলো ধ্বসে যায়—বর্ষার পরে ব্যবসায়ীরা আবার তৈরী ক'রে নেয়।

পাহাড়ে শালের গাছই বেশি—কিন্তু অন্য জাতের গাছও অল্প নয়—সে সব গাছ বাংলার মাটীতে বড় জন্মায় না। গধ, কেঁদ, পিয়াশাল। এবারে পাহাড়ের কাঁধে উঠিয়াছি, বাঁদিকে খাড়া পাহাড়ে থাকে থাকে পুঞ্জিত অরণ্য, ডানদিকে সুগভীর খাদ—ঝুঁকিয়া পড়িলে দেখা যায় অতিনিম্নে একটা শুভ্র স্বচ্ছ জলধারা—পাহাড়ের সর্ব্বত্র তাহার গুঞ্জন শোনা যায়। ঐ একটিমাত্র গুঞ্জন একতারার একটি সুরের মতো ধ্বনিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে এমন নির্জ্জনতাও দেখি নাই; এমন নিস্তব্ধতাও জানি নাই। অথচ মনে হইতেছে চারিদিক শূন্য নয়—কেমন যেন একটা গম্ গম্ ছম্ ছম্ ভাবে সমস্ত পূর্ণ! নিস্তব্ধতার মধ্যে যে একটা পূর্ণতা আছে তাহা এই প্রথম অনুভব করিলাম। ডানদিকে খাদের অপর পারে একটা পাহাড়, তাহার গায়েও অরণ্যের মেঘ-জমা।

এবারে গাড়ী নামিতেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ীটা একটা সমতল মাঠে আসিয়া পড়িল! মাঠ বটে কিন্তু তার চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা; পাহাড়ের পা হইতে চূড়া অবধি ঘন অরণ্যে ঠাসা। মাঠের মাঝে বেশি গাছ নাই—কতকগুলি গাছ এদিকে ওদিকে ছড়ানো।

প্রকাশ শুধাইল—এসব বনে কি থাকে?

অরুণ বলিল—সব রকম প্রাণীই থাকে, হাতী, বাঘ, ভালুক, বুনো মহিষ, বুনো শূকর আরও কত কি?

এ সব কথায় সহরবাসীর মনে ভয় জন্মানো অস্বাভাবিক নয় ভাবিয়া সে বলিল—কিন্তু ওরা দিনের বেলায় বের হয় না।

দিনের বেলায় বাহির হইলেই বা ক্ষতি কি? এখানে দিনে রাতে প্রভেদ কোথায়?

গুপ্ত বলিল—ঐ যে উঁচু মাচাটা দেখছ—ওটা চাষীরা হাতী তাড়াবার জন্যে তৈরি করেছিল।

অদূরে প্রকাণ্ড একটা আম গাছকে আশ্রয় করিয়া একটি উঁচু মাচা বাঁধা আছে বটে। আর চাষীর উল্লেখে নজর পড়িল সম্মুখেই কয়েকখণ্ড ধান-কাটা নেড়া ক্ষেত।

আমি বলিলাম—হাতী কি এখানে আসে না কি?

—আসে বই কি! এই সেদিনেও এক পাল হাতী নেমেছিল।

তবে একটি নয়, এক পাল। খুব আশ্বাসের সংবাদ বটে।

গাড়ী আসিয়া একটা পাহাড়ের নীচে থামিল।

গুপ্ত বলিল—এবারে নামা যাক! সকলে নামিলে সে বলিল—ওখানে একটা বড় ঝরণা আছে—চলো দেখে আসি।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম, শাল, পিয়াশালের গাছে জায়গাটা অন্ধকার—কিন্তু বনভূমি বেশ পরিষ্কার, বাংলা দেশের বনের মতো আগাছায় আচ্ছন্ন নয়। শুঁড়ি পথ অসমতল, ছোট বড় পাথরে আকীর্ণ। আরও কিছু দূর আসিয়া জলধারার শব্দ কানে আসিল—একটা গাছের আড়াল কাটাইয়া চোখে পড়িল প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু হইতে একটি জলধারা সবেগে নীচে পড়িতেছে—এই সেই ঝরণা। ঝরণার ধারার নামে পাহাড়টার নাম ধারাগিরি।

ঝরণার কাছে আসিয়া তিন জনে দাঁড়াইলাম। জল পড়িয়া নীচে গভীর গর্ত্ত হইয়াছে—তাহাতে জল সঞ্চিত। অরুণ বলিল যে

অশরীরী

বর্ষাকালে ঝরণা অত্যন্ত স্ফীত হইয়া সমস্ত জায়গাটাকে প্লাবিত করিয়া দেয়। এখন শীতকালে ঝরণার ধারা সঙ্কুচিত। উপরে চাহিয়া দেখি ধাপে ধাপে পাহাড়, থাকে থাকে অরণ্য। ঐ ঝরণার ঝর্‌ঝর্‌ শব্দের ফাঁকে ফাঁকে বন্য পাখীর ডাক কানে আসিতেছে, কখনো বা এক আধটা হাম্বারব—বুঝিতে পারা যায় নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে রাখালেরা গোরু চরাইতে আসিয়াছে।

ঝরণার নিকট হইতে জিপ গাড়ীর কাছে যখন ফিরিলাম তখন অপরাহ্ণ।

অরুণ বলিল—জায়গাটা চারদিকে পাহাড়-ঘেরা ব'লে অন্ধকার এখানে অতর্কিতে এসে পড়ে।

সে আরও বল্‌ল—হঠাৎ আলো হঠাৎ অন্ধকার এখানকার নিয়ম।

সে জানালো দিনের বেলায় এখানে যেমন ভয়ের কোন কারণ নেই সন্ধ্যার ছায়া নামবামাত্র তেমনি ভয়ের কারণ আসন্ন হ'য়ে ওঠে।

—ভয়টা কিসের ?

—বাঘ ভালুকের ?

—বাঘ ভালুকের তো বটেই—

—আবার কি হবে ?

অরুণ বলিল—সে কথা ভালো ক'রে বোঝাতে পারবো না, কারণ তা আমার অভিজ্ঞতার বাইরে, তবে অনেক লোকের মুখে শুনেছি যে—তারা সবাই যে অশিক্ষিত গ্রাম্যলোক এমন নয়—তারা বলেছে যে··

—কি বলেছে খুলেই বলো না, এত ভূমিকা কিসের ?

—সুদীর্ঘ ভূমিকা করলেও ভালো ক'রে বোঝাতে পারবো না, কারণ নিজেই বুঝিনি। যে সব কথা শুনেছি তা নিজের জ্ঞানের ও বিশ্বাসের সঙ্গে থাপ থায় না।

—চোর ডাকাত নিশ্চয়ই নয়।

—ও বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। এখনে মহামূল্য জিনিষ ফেলে গেলেও পরদিন ফিরে পাবে, খোয়া যাবে না।

—তবে আর কি হতে পারে ?

—সেই তো বুঝ্তে পারি না।

—ভূত প্রেত ?

—না তাও ঠিক নয় ! আমরা যাকে ভুত-প্রেত বলি তার আবাস লোকালয়ের কাছাকাছি। এ আর এক রকম সত্তা।

প্রকাশ অধীর হইয়া বলিল—তুমি এইসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করো।

—বিশ্বাস করি এমন বলিনি, তবে যারা বিশ্বাস করে, প্রত্যক্ষ করেছে তাদের কথাই বলছি।

—তাবা হাম্বাগ্।

ততক্ষণে জিপের নিকট পৌছিয়া ফ্লাস্কে-ভরা চা আর টিফিন-বাস্কেটে-ভরা খাদ্যগুলা বাহির কবিয়া তিনজনে খাইতে সুরু করিলাম।

আমি বলিলাম—খুলেই বলো না তারা কি বলেছে ?

তরুণ বলিল—বাড়ী ফিরে গিয়ে হবে।

—কেন এথানে ভয়টা কিসের ?

—ভয় ঠিক নয়। বাড়ী গিয়ে পৌছে ধীরে সুস্থে আলোচনা করা যাবে।

—তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে ভয়ের কারণ অল্প স্বল্প আছে।

—আছে বলেই শুনেছি। ওসব আলোচনায় নাকি তারা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

—তারা কারা?

—তারা এক রকম ওআইল্ড স্পিরিট।

প্রকাশ বলিল—বনে ঘুরে ঘুরে তুমি বুনো হ'য়ে গিয়েছ দেখ্‌ছি গুপ্ত!

—এতই যদি অবিশ্বাস, তবে আবার আগ্রহ কেন?

—অহৈতুক কৌতুহল ছাড়া কিছু নয়

—রূপকথা শুনি বলে কি তাতে বিশ্বাসও করতে হবে? পক্ষীরাজ ঘোড়ায় তুমি কি বিশ্বাস করতে বলো?

—আমি কিছুই বলি না। কিন্তু লোকে ঐ রকম বিচিত্র পশু পক্ষী এখানে দেখতে পেয়েছে। যারা দেখেছে তারা তোমার আমার চেয়ে কম শিক্ষিত নয়, কম বুদ্ধিমান নয়।

—এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে?

—এখানে বিংশ শতাব্দী কোথায়? একে খৃষ্টপূর্ব্ব পাঁচ হাজার শতাব্দী বল্‌তে দোষ কি? তুমি আমি বিংশ শতাব্দীর লোক, ঐ নরসিংগড় শহর বিংশ শতাব্দীর—কিন্তু এই পাহাড়, এই অরণ্য, এই সমতল ক্ষেত্র—একি বিংশ শতকের? পাঁচ হাজার বছর আগে এসব যেমন ছিল আর পাঁচ হাজার বছর পরেও ঠিক তেমনি থাকবে। এখান-কার সংস্কার স্বতন্ত্র।

—তোমার ফিলজফির ব্যাখ্যা রেখে আসল ব্যাপারটা কি খুলে বলো।

তরুণ আরম্ভ করিল—এদেশে যেসব আদি অধিবাসী আছে, সভ্য মানুষ আসবার আগেও তারা ছিল, তেমনি অদৃশ্য লোকে বা প্রেত লোকে এক শ্রেণীর আদি অধিবাসী আছে—তাদের বাস এইসব জায়গায়। মৃত মানুষের প্রেতাত্মার সঙ্গে তাদের একটা প্রভেদ আছে। প্রেতাত্মা অদৃশ্য লোকে আসে আবার পুনর্জন্ম নিয়ে চলে যায়। কিন্তু প্রেত লোকের আদিবাসীরা চিরকাল সমানভাবে বিরাজ করছে। তারা কোন মৃত মানুষের প্রেতাত্মা নয়—ঐ ভাবেই তাদের সৃষ্টি এবং স্থিতি। কি রকম জানো, বিধাতা যেন তাদের গড়তে গড়তে অসম্পূর্ণ করে রেখে তারপরে তাদের কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছেন। তাই এদের জগতের নিয়মের সঙ্গে সাধারণতঃ আমরা যাকে প্রেত জগৎ বলি তার নিয়ম মেলে না।

—তার মানে বলতে চাও এ একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ?

—তাই বটে! এজগতের মানুষ, পশু, পাখী এমন কি গাছ-পালারও স্বতন্ত্র নিয়ম।

—অর্থাৎ ভূতে-পাওয়া গাছ? গুপ্ত তোমার রোগ চিকিৎসার বাইরে।

গুপ্ত হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—চলো, আর দেরী নয়।

তারপরে নিজের মনেই যেন বলিল—নাঃ, খুব দেরী হ'য়ে গেল।

—কেন এত ভয় কিসের?

সে এবারে বিরক্ত হইয়া বলিল—প্রকাশ, তোমার জানা জগৎ

ছাড়াও যে অন্য নিয়মের জগৎ থাকতে পারে এই মোটা কথাটায় বিশ্বাস করতে পারো না কেন? অন্ধকার হ'বামাত্র এখানকাব নিয়ম পালটে যায়। এটা আমার অভিজ্ঞতার কথা। নাও ওঠো।

জিপ ছুটিল। কিন্তু তর্ক বিতর্কে যে আমরা কতক্ষণ কাটাইয়া দিয়াছি সে হুঁস ছিল না। সমতল হইতে পাহাড়টাব গোড়ায আসিবার আগেই দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ অন্ধকার হইয়া গেল। অন্ধকার যে এমন অতর্কিতে আসিতে পারে সে ধারণা আমাদের ছিল না। গুপ্ত একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করিয়া এঞ্জিনে জোর দিল, আলো দুটা জ্বালাইয়া দিল—গাড়ী পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। পথ সরল নয়, ঘন ঘন মোড় ঘুরিয়াছে। একবার একটা মোড ঘুরিতেই গুপ্ত অস্ফুটস্বরে নিজ মনে বলিয়া উঠিল—যা ভেবেছিলাম—

আমরা দু'জনে চকিত হইয়া উঠিলাম, ব্যাপাব কি?

তিনজনেই দেখিতে পাইলাম পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ পথ রুদ্ধ করিয়া বৃহদাকার কি একটা বস্তু পড়িয়া আছে।

গাছ? পাথর? না কোন বন্য জন্তু? জিনিষটার নড়া চড়া নাই। গুপ্ত এঞ্জিন বন্ধ করিয়া দিল। আমরা বলিলাম—এ কি করলে? সে বলিল—যদি হাতী হয়?

—বুনো হাতী?

—বনে বুনো হাতী ছাড়া আর কি আসবে?

—এঞ্জিন বন্ধ করলে কেন?

—অনেক সময়ে চার্জ্জ করে।

এক মুহূর্ত্ত পরে তিনজনেই এক সঙ্গে দেখিলাম কোথাও কিছু নাই।

প্রকাশ হাসিয়া বলিল—গাছের ছায়া টায়া হবে।

গুপ্ত বলিল—অন্ধকারে ছায়া পড়তে যাবে কেন?

তারপরে বলিল—এ রকম অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে। সামনে আর একটা খারাপ জায়গা আছে—সেটা পার হ'তে পারলেই—

—রাস্তা খারাপ?

—না জায়গাটাই খারাপ।

—তার মানে।

গুপ্ত অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিল—এখানে নয় বাড়ী গিয়ে হবে।

যেন কাহার ভয়ে সে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নীচে নামাইয়া কথাটি উচ্চারণ করিল।

জিপ ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে একটি মোড় ঘুরিল, দুদিকেই সমান অন্ধকার, একদিকে খাড়া পাহাড়, একদিকে গভীর খাদ; খাদের মধ্যে প্রবাহিত নদীর শব্দ এখন দিনের চেয়ে অনেক স্পষ্ট, সম্মুখে জিপের যুগল আলোয় প্রত্যক্ষ পথ, সম্মুখে কোন বাধা নাই। এমন সময়ে বারকয়েক গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া এঞ্জিন থামিয়া গেল। অনেক সাধ্য-সাধনাতেও এঞ্জিন আর চলিল না। প্রকাশ মোটর যন্ত্রের বিশেষজ্ঞ, সে গুপ্তর পাশে বসিয়া ছিল, সেও সাধ্যমত চেষ্টা করিল, কিন্তু এঞ্জিন চলিবার বা গাড়ী নড়িবার কোন লক্ষণ দেখাইল না।

প্রকাশ বলিল—হঠাৎ এমন হ'ল কেন?

গুপ্ত বলিল—হঠাৎ এমন নয়, আগেই আশঙ্কা ক'রেছিলাম। এ জায়গাটাতে রাত বিরেতে গাড়ী প্রায়ই খারাপ হ'য়ে থাকে।

—এখন কর্ত্তব্য কি?

গুপ্ত বলিল—ফিরে চলো—

—গাড়ী যে অচল—

—গাড়ী এখানে থাক্, আমাদের হেঁটে ফিরতে হবে—

—এই বলিয়া সে নামিয়া পড়িল, বিজলি বাতির মশাল জ্বালাইয়া চরিদিক দেখিয়া লইয়া বলিল—তোমরা এসো।

তিনজনে সারবন্দী ভাবে ফিরিয়া রওনা হইলাম। পাহাড়ের উপর বেশী দূর উঠি নাই, অল্পক্ষণ পরেই সমতলে নামিয়া আসিলাম। আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া হাতী-তাড়ানো সেই মাচাটার কাছে গুপ্ত আসিয়া দাঁড়াইল। যাইবার সময়ে এটাকে দেখিয়াছিলাম, একটা আমগাছকে আশ্রয় করিয়া মাচাটি বাঁধা।

গুপ্ত বলিল—উঠে পড়ো, আজ রাতটা এখানে কাটাতে হবে।

আমরা একসঙ্গে বলিলাম—একি ব্যবস্থা ?

গুপ্ত বলিল—তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো, বেশীক্ষণ নীচে থাকা নিরাপদ নয়। বাঘ ভালুক নিকটেই থাকতে পারে।

অগত্যা মাচায় উঠিলাম, গুপ্ত সব শেষে উঠিল।

মাচার বাঁশের পাটাতনের উপরে এক পত্তন খড় পাতা, উপরে খড়ের একটা ছাঁউনি।

একটু সুস্থ হইলে পরে গুপ্ত বলিল—তোমাদের এখানে এনে ভালো করিনি, আর আসলেও সময় মতো ফেরা উচিত ছিল।

—ভয়টা কিসের ?

—ভূত প্রেতের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। বাঘ ভালুকের ভয় তো আছে।

—অতএব ?

—অতএব কষ্ট করে এখানে রাত্রিযাপন ব্যতীত উপায় নাই, এমন আরও একবার আগে ঘটেছে।

প্রকাশ বলিল—ভূত প্রেত দেখেছ নাকি?

—না।

তাহার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উত্তরে কেমন যেন সন্দেহ হইল, বলিলাম, বাঘ ভালুক?

—না তাও দেখিনি।

বিজলি আলোকে ঘড়িতে দেখিলাম কেবল আটটা। কিন্তু এ কি নিস্তব্ধতি! যেন ভুলিয়া-যাওয়া জগতের খনির ভিতরকার অন্ধকার!

সারা দিন ঘোরাঘুরি হইয়াছিল, কাজেই যাঁহার গায়ে যা গরম কাপড় ছিল তাহাই জড়াইয়া কোন রকমে শুইয়া পড়িলাম। ঘুম আসিতে বিলম্ব হইল না।

তখন কত রাত জানিনা হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল, জাগিয়া উঠিয়া দেখি সমস্ত বনে যেন ঝড় বহিতেছে, গাছের ডাল-পালার সে উদ্দাম মাতামাতি। কিন্তু আরও একটু সম্বিৎ হইবামাত্র বুঝিলাম যে এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। সমস্ত অরণ্যটা নড়িতেছে—অথচ আমাদের গাছটায় একটুও সাড়া নাই—আর হাওয়া কোথায়! একটা বনকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে যে প্রচণ্ড ঝড়ের দরকার তাহাতে মাচা সমেত আমাদের উড়িয়া যাইবার কথা! কিন্তু তাহার কোন লক্ষণ নাই।

ভাবিতে লাগিলাম এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি! দেখিলাম প্রকাশ ও গুপ্ত অঘোরে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। একবার মনে হইল তাহাদের জাগান যাক্ আবার ভাবিলাম তাহাদের সুখস্বপ্নে ব্যাঘাত করিয়া

কি ফল ? দেখাই যাক না কতদূর কি হয়। এই ভাবিয়া গাছের একটা ডাল ঠেসান দিয়া সুস্থ হইয়া বসিলাম, ঘুমাইবার আশা অনেকক্ষণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম।

হঠাৎ অরণ্যের চঞ্চলতা থামিয়া গেল। চারিদিক ঘুমন্ত শিশুর মত নিস্তব্ধ হইল। হাওয়া যেমন মন্ত্রে উঠিয়াছিল তেমনি মন্ত্রেই যেন থামিল। চারিদিকে খাড়া পাহাড়ে-ঘেরা উপত্যকার মধ্যে অন্ধকার রাত্রি সরোবরের বদ্ধ জলের মতো বোবা—তাহার ভাব যেন মনের উপর চাপিয়া বসে। এ রকমভাবে মূঢের মতো জাগিয়া থাকা নিরর্থক মনে করিয়া আবার শুইবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময়ে হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম—এ কি! যতদূর মনে পড়িতেছে দিনের বেলায় তো এমন লক্ষ্য করি নাই। দিনের বেলায় দেখিয়াছিলাম —উপত্যকাটা ফাঁকা, গাছপালা বিরল, বন আরম্ভ হইয়াছে পাহাড়-গুলার পাদদেশে। এখন মনে হইল উপত্যকা যেন গাছে ভরিয়া গিয়াছে—মাঝখানে সামান্য একটুখানি ফাঁক। এত গাছ আসিল কোথা হইতে ? বুঝিলাম রাত্রির অন্ধকার ও স্থানের অপরিচয় দুইয়ে মিলিয়া চোখের ধাঁধা সৃষ্টি করিয়াছে—নতুবা গাছ গজাইবার সম্ভাবনা কোথায় ? বিজলি বাতিটা তুলিয়া লইয়া আলোর পিচকারি ছুঁড়িলাম—যতদূর দেখিলাম উপত্যকা ফাঁকা। কিন্তু যেমনি আলো নিভাইয়া দিলাম, অমনি আবার গাছপালার ভিড়ের অনুভূতি হইল। আরো দুই তিনবার আলো জ্বালাইয়া পরীক্ষা করিলাম—ফলাফল পূর্ব্ববৎ। এ কি চোখের মায়া না আর কিছু ?

মনে পড়িল গুপ্ত বলিয়াছিল যে এখানকার গাছপালাও জীবিত! কথাটা সত্য হইতে পারে না। কিন্তু সমস্যাটা লইয়া

বুদ্ধি আর সংস্কারের মতভেদ দেখা দিল। বুদ্ধি বলে কেমন করিয়া হইবে? সংস্কার বলে—চোখে দেখিতে পাইতেছ না কি? ভাবিলাম জগতের সব রহস্যই কি আমার অবগত। যদি সত্যই গাছপালা গুলি জীবন্ত হয়! তবে তাহাদের আগাইয়া আসা তো অসম্ভব নয়! কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? সারিবদ্ধ শ্রেণীর মতো তাহারা আগাইয়া আসিতেছে কেন? কে তাহাদের লক্ষ্য? আমরা কি? গা-টা ছমছম করিয়া উঠিল? তবে তো এই মাচা-বাঁধা আমগাছটাও জীবন্ত হইতে পারে! সভয়ে একবার এদিক ওদিক চাহিলাম। নাঃ গাছটা গাছের মতো অচল ও নীরব। তবু ভয় যায় না।

এ সব কথা দিনের বেলায় শুনিয়া লোকে হাসিবে, আমিও হাসিয়াছি—সেদিন রাত্রে, সেখানে বসিয়া যে-ভাব মনে উদিত হইয়াছিল তাহার সঙ্গে হাসির মিল নাই। একবার ভাবিলাম গুপ্ত ও প্রকাশকে জাগাই, তারপরে ভাবিলাম বেচারারা ঘুমাইতেছে তাহাদের সুখে ব্যাঘাত করিয়া কি লাভ? মূঢ়ের মতো, সর্পমুগ্ধ হরিণের মতো একদৃষ্টে উপত্যকার দিকে তাকাইয়া জাগিয়া বসিয়া রহিলাম।

বনে যে এত রকম বিচিত্র শব্দ হইতে পারে তাহা জানিতাম না, দিনের বেলায় অন্ততঃ শুনি নাই। কোন শব্দ বা টুং টুং করিয়া ঘণ্টার মতো বাজিতেছে, কোথাও বা একটানা করুণ আওয়াজ: কোন শব্দ বা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মতো। পরে খোঁজ করিয়া জানিয়াছিলাম ও সব বন্য পাখীর ডাক। হঠাৎ অদূরে গাধার ডাক শোনা গেল। গাধা গৃহপালিত জীব—এখানে আসিবে কি ভাবে? ইহার সম্বন্ধেও পরে খোঁজ করিয়াছিলাম,

অশরীরী

শুনিয়াছিলাম যে বুনো হাতীর ডাক অনেটা গাধার ডাকের মতো শ্রুত হয়। বিচিত্র শব্দের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে সমস্ত অরণ্যটাকে সজীব বলিয়া মনে হইল! আমার কেমন যেন বোধ হইল যে সারা বনময় একটা কানাকানি, জানাজানি, উসখুস, ফিসফাস পড়িয়া গিয়াছে, যেন একটা ষড়যন্ত্রের উদ্যোগ।

আমার মনের একটা অংশ যখন এই সব চিন্তা করিতেছিল তখন আর একটা অংশ ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সংশয়পোষণ করিয়া হাসিতেছিল—মনের মধ্যে দুটা পরস্পরবিরোধী ধারা পাশাপাশি বহিতেছিল সে বিষয়ে আমি ক্ষণে ক্ষণে সচেতন হইয়া উঠিতেছিলাম —আর সেই দোটানার স্রোতে অসহায় আমি তরণীর মতো উৎক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত হইতেছিলাম! এ এক অভাবিত অভিজ্ঞতা। হঠাৎ গাছের ফাঁক দিয়া উপরের দিকে নজর পড়িতেই দেখিতে পাইলাম শিশিরমার্জ্জিত আকাশে গোটা দুই উজ্জ্বল তারকা জাদুকরের মোহময় চক্ষুর মতো আমার দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া তাকাইয়া আছে। চিরকাল আকাশের তারা আমরা মানবপরিবেশ হইতে দেখিতে অভ্যস্ত, আজ মানবস্পর্শবিমুক্ত প্রকৃতির বুকের কাছে বসিয়া তাহাদের দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলাম তারা কেবল সুন্দর নয়, ভয়ালও বটে। বটে, তবে এই মোহদৃষ্টি ঐ জাদুকরেরই কাজ?' তবে এ সমস্তই ঐ নিশীথিনীরই কাজ!

হে জাদুকরী, এ নিশীথিনী, তোমার অন্ধকারের থলি হইতে জাদুদণ্ড বাহির করিয়া কেন বিশ্বের চোখে বুলাইয়া দিয়াছ জানিনা, কিন্তু তাহাতে যে সমস্ত দৃশ্যের, সমস্ত মূল্যের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে তাহাতো প্রত্যক্ষ করিতেছি। ঐ পাথরেগড়া পাহাড়

এখন ছায়াসম, ঐ মাটিতে শৃঙ্খলিত অরণ্য সৈন্যবাহিনীর মতো সচল, ঐ পশুপক্ষীর রব এখন সুগভীর ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ, ঐ যে দিবালোকের নিরীহ নীরস জগৎটা এখন মায়াপুরীর উন্মুক্ত বাতায়নের নিকটবর্ত্তী অলিন্দের মতো প্রতিভাত—এতো প্রত্যক্ষ দেখিতেছি! এই মুহূর্ত্তে ইহার মধ্যে অবিশ্বাসের সূচ্যগ্র বিঁধাইবার স্থানও তো নাই! দিনের বেলায় একথা মনে পড়িয়া হাসি আসিবে—কিন্তু যে উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় বসিয়া আছি তাহা তো মিথ্যা নয়।

অরণ্যের চঞ্চলতায় আমার সাময়িক মুগ্ধভাব ভঙ্গ হইল। আবার ঝড় উঠিয়াছে—গাছের ডালপালার আর্ত্তনাদ—অথচ এক ফোঁটা বাতাস গায়ে লাগিতেছে না, এ যেন ছবির ঝড়। এ কোন্ মায়ালোকের ঝড়! কোন্ জাদুজগতের অন্তঃকুহর হইতে এই ঝঞ্ঝা যেন প্রশ্বসিত! আমি এই জাদুজগতের অন্তর্গত নই বলিয়াই তাহা আমাকে স্পর্শ করিতেছে না।

এবারে আমাদের গাছটাও মড়মড় করিতেছে—কিন্তু বলাবাহুল্য কোথাও বাতাস নাই। সিগারেট ধরাইলাম। দেশলাইয়ে কাঠি নিঃস্পন্দ শিখায় জ্বলিল। উপত্যকার বনময় এই যে মাতামাতি এ যেন অন্ধকারকে মন্থন করিয়া কি এক রহস্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা। কি সেই রহস্য? তাহা যদি জানিতাম তবে প্রকৃতির শেষ কথাটাই হয় তো জানা হইয়া যাইত! সে রহস্য মানুষের জানিবার নয়—কেবল সেই রহস্য-পারাবারের তীরে বসিয়া ঢেউ খাইবার, অনুমান করিবার, শীকরজালে অঙ্কিত রামধনু দেখিবার এবং অতলে তলাইয়া যাইবার অধিকার মানুষের আছে; সে রহস্য জানিবার অধিকার নাই।

প্রকাশ ঠেলিতেছে, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম।

প্রকাশ বলিল—খুব ঘুমোলে!

গুপ্ত বলিল—সিগারেটের ছাই এলো কোথা থেকে?

আমি বলিলাম—রাতে একবার উঠেছিলাম।

প্রকাশ বলিল—কিছু দেখতে পেলে? গুপ্তর গাছের নড়াচড়া—

সংক্ষেপে বলিলাম—না।

মনে হইল ঐ সিগারেটর ছাই সাক্ষী না থাকিলে রাতের অভিজ্ঞতাকে আমার নিজেরই তো স্বপ্ন বলিয়া মনে হইত, অন্যে কেন বিশ্বাস করিতে যাইবে। বুঝিলাম যে শেষ রাতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

প্রকাশ অবিশ্বাসে হাসিতে লাগিল; প্রমাণাভাব বশতঃ গুপ্ত চুপ করিয়া রহিল। আমিও নীরব ছিলাম, কিন্তু অন্য কারণে। রাত্রির অভিজ্ঞতাকে জীবনের সঙ্গে খাপ খাওযাইয়া লইতে ব্যস্ত ছিলাম, কথা বলিবার অবসর ছিল না।

তিনজনে মাচা হইতে নামিয়া জিপ গাড়ীটার কাছে আসিলাম। গাড়ী পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। এবারে গাড়ীতে চড়িয়া যন্ত্রে দম দিতেই গাড়ী সুবোধ বালকটির মতো নড়িয়া উঠিয়া ছুটিল। রাত্রির অবাধ্যতার লক্ষণমাত্র প্রকাশ পাইল না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নিরাপদে আমরা গুপ্তর সরকারী বাসায় আসিয়া পৌছিলাম।

তারপরে অনেক কাল গিয়াছে, এখনো সে রাত্রির অভিজ্ঞতা বিনা বাতাসে ঝড়ের মতো আমার মনকে মাঝে মাঝে নাড়া দেয় —জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে আজও তাহাদের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারি নাই।

পুরন্দরের পুঁথি

জীবনে পুরন্দরের একমাত্র বিলাস ছিল বই পড়িবার অভ্যাস। ওটাকে একটা বাতিক বলাই উচিত। সে রাশি রাশি বই কিনিত, সব যে পড়িত এমন বলিতে পারি না, কারণ এক জীবনে তত বই পড়িয়া ওঠা সম্ভব নয়। বই কিনিত, কতক পড়িত, বাকী অমনি পড়িয়া থাকিত, সে বলিত যে এমন সময় আসা অসম্ভব নয় যখন বই কিনিবার সামর্থ্য থাকিবে না। তখনকার জন্য ওগুলো জমা থাকিতেছে! তাহার শয়ন ঘরটির মেঝে হইতে ছাদ পর্য্যন্ত রাশি রাশি বইয়ে ভরিয়া গিয়াছিল। ঐ বইয়ের মধ্যেই শয়ন করিত পুরন্দর। বিছানাতেও বইয়ের স্তূপ। বইগুলা একটু সরাইয়া দিয়া রাত্রে শুইত। যখন শুইবার জায়গা থাকিত না, তখন ঘরে আর একখানা তক্তপোস আনিয়া নূতন শয্যা প্রস্তুত করিত। এমনিভাবে সমস্ত ঘরটি তক্তপোষে ভরিয়া গিয়াছিল।

সংসারে তাহার কেহ ছিল না। লোকে বিবাহ করিতে বলিলে সে বলিত, সময় কোথায়? সে বলিত বই আর বউ একসঙ্গে অচল, তাই যা আছে তার সঙ্গে আর নূতন সমস্যা যোগ করা উচিত নয়। এদিকে তাহার বিবাহের বয়সও অনেকটা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বোধকরি সে নিজেও মনে মনে বিবাহের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল। এখন সে নিশ্চিন্ত মনে বই পড়ে।

অশরীরী

কলিকাতা থেকে দূরে একটি গ্রামে পুরন্দরের বাস, আমিও সেই গাঁয়ে থাকি—এক পাড়ায় বলিলেই চলে। মাঝে মাঝে সে কলিকাতা চলিয়া যায়, নূতন বই সংগ্রহ করিয়া আনিবার উদ্দেশ্যে। সে বলে যে নূতন বই পড়ে ছাত্ররা এবং পণ্ডিতরা, গ্রন্থবিলাসীদের জন্যে পুরাতন বই। সে বলে যে, পুরাতন বইয়ের একটা ব্যক্তিত্ব আছে, তাতে করিয়া পড়া বেশ জমিয়া ওঠে, মনে হয় যেন দু'জনে বসিয়া পড়িতেছি।

পুরন্দরের দৃষ্টান্তে আমারও বই পড়ার নেশা জমিয়া উঠিয়াছিল, তবে তফাৎ ছিল এই যে, সে বই কিনিয়া পড়িত, আমি তাহার নিকট চাহিয়া লইয়া পড়িতাম। আরও একটু তফাৎ ছিল, আমার জীবনে আরও পাঁচটা কাজ ছিল, তার মতো বই পড়াই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না।

এই বই পড়ার সূত্রে তার সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল—গাঁয়ের আর কারো সঙ্গে সে বড় মিশিত না। কতবার তার বাড়ীতে গিয়াছি, দেখিতে পাইয়াছি যে সে জানলার কাছে বসিয়া বাহিরের ঐ পাহাড়গুলার দিকে তাকাইয়া আছে—কোলের উপর একখানা খোলা বই, আর চারপাশে স্তূপীকৃত পুস্তকের প্রাচীর।

আগেই বলিয়াছি যে, কলিকাতা হইতে দূরে আমাদের বাস। এবারে আর একটু পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। ছোটনাগপুরের ছোট একটি সহরে আমরা থাকি, শহরটি এত ছোট যে, বড় গ্রাম বলিলেই চলে। পুরন্দরের বাড়ীটি সহরের একপ্রান্তে, তারপরেই ধান ক্ষেত আরম্ভ হইয়াছে—ধান ক্ষেতের পরে সুবর্ণরেখা নদী—নদীর ওপারে পাহাড় আর বন, বন আর পাহাড়।

পুরন্দর বলে, বই পড়া যার জীবনের লক্ষ্য—তার আদর্শ বাসস্থান এইরকম হওয়াই উচিত।

একদিন সকালবেলা পুরন্দরের চাকর আসিয়া আমাকে বলিল যে, বাবু একবার আমাকে যাইতে বলিয়াছেন।

বুঝিলাম যে কিছু নূতন বই আসিয়াছে। ঐরকম উপলক্ষ্য ছাড়া আমার বড় ডাক পড়ে না।

পুরন্দরের বাড়ী পৌছিয়া দেখি যে, আমার অনুমান মিথ্যা নয়। দেখিলাম প্রকাণ্ড একটা কাঠের বাক্স হইতে ধূলা ঝাড়িয়া পুরন্দর বই বাহির করিতেছে, আমাকে দেখিয়া বলিল—

—কাল রাতে নিয়ে এলাম?

—কলকাতা গিয়েছিল নাকি?

—হ্যাঁ, কদিন আগে এক লটে অনেক বই বিক্রী হচ্ছে বিজ্ঞাপন দেখে কলকাতা গিয়েছিলাম, কাল শেষ রাতে ফিরেছি।

—কি বই?

সে বলিল—পাঁচরকম মিশানো আছে। এক সাহেব এদেশ থেকে বাস তুলে দিয়ে বিলেত ফিরছে—তারই বই। লোকটা খুব পণ্ডিত, চীনে ভাষাও জানে—

এই বলিয়া বিচিত্র হরফে ছাপা একখানা জীর্ণ বই টানিয়া বাহির করিল।

অক্ষর যখন চিনি না কাজেই চীনা ভাষা হইতে বাধা নাই—হিব্রুভাষা বলিলেও আমার আপত্তি করিবার কারণ ছিল না।

সে বলিল—মাত্র পাঁচশো টাকায় পাওয়া গেল—খুব সস্তায় পেয়েছি।

ভাবিলাম হবেও বা।

সেদিনই বিকাল বেলা ক'দিনের জন্য আমাকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হইল, কাজেই পুরন্দরের চীনা ভাষার পাঠোদ্ধার কতদূর হইল জানিতে পারি নাই।

পাঁচ ছ' দিন পরে ফিরিয়া একদিন পুরন্দরের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।—ওহে অ-চীনা ভাষার বই যদি কিছু থাকে দাও, নিয়ে যাই।

পুরন্দর সে প্রসঙ্গের উত্তর না দিয়া বলিল—বসো একটা কথা আছে।

চাহিয়া দেখি তাহার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর।

শুধাইলাম—কি ব্যাপার? অসুস্থ নাকি?

সে বলিল—আজ ক'দিন রাতে ঘুম হচ্ছে না।

আমি বলিলাম—ঘুমের দোষ কি? রাত জেগে পড়লে—

বাধা দিয়া বলিল—ঠিক উল্টো, রাতে পড়তে পারছি না, বই খুলে বসলেই ঘুমিয়ে পড়ি, আর অমনি দুঃস্বপ্ন দেখি—

দুস্বপ্ন? এমন কথা তো তাহার মুখে আগে শুনি নাই, বলিলাম—স্বপ্ন সবাই দেখে, তার জন্যে আবার দুশ্চিন্তা কেন?

সে বলিল—স্বপ্ন সবাই দেখে, আমিও দেখেছি, কিন্তু এ সে রকম নয়, কিছু বিশেষত্ব আছে।

সে বলিতে লাগিল—একই স্বপ্ন আজ ক'দিন দেখ্‌ছি।

—কি রকম?

—একটা অদ্ভুত চেহারার লোক ঘরে ঢুকে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—কি রকম চেহারা ?

—চোখ ছোট, নাক চেপ্টা, চোয়াল উঁচু, সামান্য কটা দাড়ি আছে, মাথায় জটা।

—ওসব তোমার কল্পনার বিকার।

—কল্পনা আসবে কোথা থেকে ? ওরকম চেহারার বর্ণনা কীণ্ গীর পড়িনি।

—ক'দিন দেখ্‌ছ ?

—যেদিন কল্‌কাতা থেকে ফিরে এলাম, তার পরে থেকেই। প্রথমে কিছু মনে হয়নি, কিন্তু পর পর কদিন দেখবার পরে কেমন যেন ভয়ের মতো ধরেছে। অনেকবার ভেবেছি রাতে ঘুমোবো না, বই পড়েই কাটিয়ে দেবো—কিন্তু তা হবার জো নেই, বই খুলে বসবামাত্র চোখ জড়িয়ে আসে—আর ঘুমোবামাত্র সেই একই স্বপ্ন। সেই অদ্ভুত চেহারা। কি তার দৃষ্টি, যেন জিজ্ঞাসার আগুন বের হচ্ছে চোখ দিয়ে।

তারপর সে বলিল—তুমি আমার এখানে এসে রাতে ঘুমোও না ?

অনুরোধটা করিবামাত্র সে যেন লজ্জা অনুভব করিল, বলিল—না, না, তার দরকার নেই।

আমি বলিলাম, তোমার দরকার না থাকতে পারে, আমার আছে। রাতে এখানে থাকলে তোমার নূতন চালানের বইগুলো দেখতে পারবো।

লজ্জার হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছি মনে করিয়া সে বলিল—মন্দ নয়, পাশের ঘরটা তোমার জন্য ঠিক ক'রে রাখবো যতক্ষণ খুশি প'ড়ো।

অশরীরী

রাতে পুরন্দরের বাড়ীতে শুইতে আসিলাম। পুরন্দরের পাশের ঘরে আমার শুইবার ব্যবস্থা হইয়াছে—দুই ঘরের মাঝখানে দরজা; দরজাটা খোলা থাকিবে। বাহিরে বৃষ্টি হইতেছে। পুরন্দর একখানা বই লইয়া বসিল, আমি খানকতক বই লইয়া আমার শয্যার উপরে উঁচু করিয়া বালিশে হেলান দিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ না যাইতেই পুরন্দরের নাসিকা গর্জনে বুঝিলাম সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আমি পড়িতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পড়িবার পর রাত কত হইয়াছে দেখিবার জন্য দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকাইলাম—রাত বারোটা। চোখের দৃষ্টি নামাইতেই জানালার দিকে তাকাইলাম—মনে হইল জানালার বাহিরে একটা যেন লোক। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল—সামান্য জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। চোর নাকি? কিন্তু চাঁদের আলোর সঙ্গে ঘরের আলো মিলিয়া পরক্ষণেই তাহার চেহারা ভালো করিয়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম—এ যে পুরন্দরের বর্ণিত চেহারা। চোখ ছোট, নাক চেপ্টা, চোয়াল উঁচু, মাথায় একরাশ জটা। হঠাৎ দেখিলে ভুটিয়া বা নেপালী মনে হয়।

কে? কে? বলিয়া জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম, কেহ কোথাও নাই। আমার চীৎকারে পুরন্দর জাগিয়া উঠিল—আমার ঘরে ছুটিয়া আসিল।

বলিলাম—তুমি উঠ্‌লে কেন?

—আবার সেই স্বপ্ন।

সে শুধাইল—তুমি এখানে কেন?

—বাইরে একটা যেন লোক দেখ্‌লাম!

—চোর?

—কেমন ক'রে বল্‌বো ?

—চলো দেখে আসি।

দু'জনে আলো লইয়া বাহিরে আসিয়া জানালার কাছে উপস্থিত হইলাম—

কোথাও কেহ নাই।

কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের এই যে, ভিজা মাটিতে কোনরূপ পায়ের চিহ্ন নাই। অথচ মাটি যেরকম নরম, পায়ের ছাপ না পড়িয়াই পারে না।

আমার বিস্ময় দেখিয়া পুরন্দর বলিল—কেউ আসেনি, তোমার চোখের ভ্রম।

চুপ করিয়া রহিলাম, লোকটার চেহারা বর্ণনা করিলাম না. করিলে পুরন্দরের ভীতি বাড়িত বই কমিত না।

সে রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন রাত্রে আবার শুইতে আসিলাম। এবারে পুরন্দরের অনুরোধের জন্য আর অপেক্ষা করি নাই—প্রবল কৌতূহল আমাকে আসিতে বাধ্য করিল।

পাশের ঘরে পুরন্দর ঘুমাইতেছে, আমি বসিয়া পড়িতেছি, হাতের কাছে একটা বিজলি বাতি। দেয়াল ঘড়ির বারোটা বাজার শব্দে চমক ভাঙ্গিল, চোখ আপনি জানালার দিকে পড়িল—সেখানে সেই পূর্ব্বদৃষ্ট মূর্ত্তি। বিজলি বাতির পিচকারি ফেলিলাম, এক মুহূর্ত্তের জন্য মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া মিলাইয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে পুরন্দর জাগিয়া উঠিয়া আমার ঘরে ঢুকিল।

—কি ব্যাপার ?

সে বলিল—সেই স্বপ্ন, সেই লোক। উঃ, কি তার চাহনি। নাঃ আর পারি না, বলিয়া আমার বিছানার উপরে বসিয়া পড়িল।

পরদিন সকাল বেলায় তাহাকে সব ব্যাপার খুলিয়া বলিলাম—বিশেষ করিয়া জানাইলাম যে তাহার স্বপ্নে দেখা লোকের এবং আমার জাগরণে দেখা লোকের চেহারা একই রকম! বলিলাম—আমি যাকে জেগে দেখেছি—তুমি তাকেই ঘুমিয়ে দেখ্‌ছ।

সে বলিল, তাহার স্বপ্নে-দেখা ভ্রান্ত নয়। আমি বলিলাম—আমার জেগে দেখাও অভ্রান্ত। কাজেই সমস্যা সমাধার দিকে না গিয়া জটিলতর হইয়া উঠিল—কোন সমাধান না পাইয়া দু'জনে নীরবে বসিয়া রহিলাম।

এইভাবেই চলিতেছিল, কতদিন চলিত এবং পরিণাম কি হইত জানি না, এমন সময়ে ঘটনার মোড় ঘুরিয়া গেল। কিন্তু তার আগে পুরন্দর ও আমার অবস্থা বর্ণনা করা দরকার। পুরন্দরের শরীর ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল; তাহার শরীর কৃশ এবং গায়ের রঙ ফ্যাকাশে হইয়া আসিল। রাতে সে ঘুমাইতে পারিত না কিংবা ঘুমাইবামাত্র স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিত তারপরে আর তাহার ঘুম আসিত না। আমি পাশের ঘরে শুইতাম এবং প্রতি রাত্রে বারোটা বাজিবামাত্র পূর্বদৃষ্ট সেই লোকটিকে জানালার বাহিরে দেখিতে পাইতাম। কিন্তু সে লোকটা রক্তমাংসের মানুষ বা ছায়ামাত্র বুঝিতে পারিতাম না, কেননা ঐ চোখের দেখা ছাড়া তাহার আর কোন প্রমাণ পাইবার উপায় ছিল না—পুরন্দরের স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তি আর আমার জাগরণে দৃষ্ট ব্যক্তি এক ও অভিন্ন। ইহা কেমন করিয়া সম্ভব জানি না, কখনো জানিতেও পারিতাম কিনা সন্দেহ। এমন সময়ে ঘটনা একটা মোচড় খাইল।

একদিন সন্ধ্যার আগে পুরন্দর ও আমি বারান্দায় বসিয়া আছি—

এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। পুরন্দরকে দেখিবামাত্র সে বলিয়া উঠিল—বাবু, আপনার কাছে এলাম।

পুরন্দর বলিল—কেন রায় মশায় ?

রায় মশায় বলিল—এই সেদিন আপনাকে যে বইগুলো বিক্রী করেছি—সেগুলো একবার দেখতে চাই।

তাহাদের কথোপকথন হইতে বুঝিলাম যে, লোকটি পুরাতন পুস্তকের ব্যবসায়ী। পুরন্দর তাহার নিকট হইতে বই কিনিয়া আনে। পুরন্দরের কাছে তাহার কথা অনেকবার শুনিয়াছি—এই প্রথম তাহাকে চোখে দেখিলাম।

পুরন্দর বলিল—সে-সব বই এখনো খুলিনি. যেমন এনেছি, তেমনি আছে—চলুন দেখবেন! কিন্তু ব্যাপার কি? এজন্য আপনাকে এতদূর আসতে হ'ল দেখে অনুমান করছি গুরুতর কিছু ঘটেছে।

রায় মশায় বসিতে বসিতে বলিল, গুরুতর তো বটেই আর ভারি আশ্চর্য্য! বইগুলো ছিল এক সাহেবের, বিলেত যাওয়ার সময়ে তার কাছ থেকে কিনেছিলাম। এসব কথা আপনি জানেন- বিক্রী করবার সময়েই বলেছি।

তারপর সে বলিল—আপনার কাছে বইগুলো বেচে দেবার পর থেকেই এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্‌ছি—

স্বপ্নের নামে আমাদের কৌতূহল বাড়িল—বলিলাম—কি স্বপ্ন ?

—একটা অদ্ভুত চেহারার লোক এসে যেন একখানা বই চায়।

—কি বই ?

—তার কথা কি ছাই বুঝতে পারি। তবে তার ভাবে ভঙ্গীতে বুঝি যে, একখানা বই চাইছে। যে জায়গায় বইগুলো ছিল হাত দিয়ে দেখায়। এমন অনেক কয়দিন ধরে স্বপ্নদেখা চলছে—সেই একই ঘটনা, সেই একই লোক। ব্যাপারটা হয়তো স্বপ্ন বলেই উড়িয়ে দিতাম—কিন্তু কাল বিলেত থেকে সাহেবের এক চিঠি পেলাম। সাহেব লিখেছে যে, বইগুলোর সঙ্গে একখানা তিব্বতী ভাষায় হাতে লেখা পুঁথি ভুল করে সে বিক্রী করে দিয়েছে। সেই পুঁথিখানা যেন অবশ্য অবশ্য সাহেবকে এয়ারমেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এই বলিয়া সে সাহেবের চিঠিখানা বাহির করিল—দেখিলাম সাহেব চিঠিতে রায় মহাশয়ের কথিত বিষয় লিখিয়াছে বটে।

পুরন্দর বলিল—চলুন ভিতরে গিয়ে খুঁজবেন।

তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, চাকরে একটি লণ্ঠন জ্বালাইয়া আনিল। আমরা তিনজন নূতন-আনা পুঁথির স্তুপের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। রায় মহাশয় পুঁথির রাশি ঘাঁটিতে লাগিল!

অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া রায় মহাশয় জীর্ণ প্রাচীন কাগজে লেখা অজ্ঞাত হরফের একখানা পুঁথি বাহির করিল—অক্ষরগুলা সব দাঁতের সারির মতো, যেন শত শত বিকশিত দন্ত পংক্তি অদৃষ্টকে ব্যঙ্গ করিতেছে! রায় মহাশয় দ্রুত পাতা উল্টাইতেছিল—হঠাৎ একটি সাদা পাতায় একটি মানুষের ছবি দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিল —এই সেই মুখ।

আমরা দ্রুত কাছে আসিয়া লণ্ঠনের আলোয় সেই বীভৎস মুখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম—পুরন্দরের ও আমার মুখ দিয়া বাহির হইল

—এ সেই চেহারা! তারপরে অনেকক্ষণ কাহারো মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না—সকলেরই বিস্ময় চরমে উঠিয়াছিল।

রায় মহাশয় পুঁথি লইয়া চলিয়া গেল। পরে সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, বিমানডাকে সে পুঁথিখানা সাহেবকে পাঠাইয়া দিয়াছিল। আর সেই পুঁথিখানা পুরন্দরের বাড়ী ত্যাগ করিবার পরে সে বা আমি স্বপ্নে বা জাগরণে কখনো সেই মূর্ত্তি দেখি নাই। তারপরে অনেক কাল গিয়াছে—এ পর্য্যন্ত পুরন্দরের স্বপ্ন দর্শনের বা আমার জাগরণে দর্শনের কারণ আবিষ্কার করিতে পারি নাই। পুরন্দরের সহিত রায় মহাশয়ের দেখা হইয়াছে—রায় মহাশয়ও আর কখনো সেরূপ স্বপ্ন দেখে নাই। ইহার কার্য্যকারণ আজ পর্য্যন্ত আমাদের তিনজনেরই অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

শুভদৃষ্টি

ছোট একটি জংশন ষ্টেশন। শীতের রাত্রি গভীর। অনেক দূরের পল্লী হইতে গাড়ী ধরিতে আসিয়াছি। পথে গরুর গাড়ীর একটি চাকা ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, গাড়ী ফেল করিলাম। আবার সেই শেষ রাত্রে গাড়ী। এখনো পাঁচ ছয় ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে। সৌভাগ্যক্রমে ওয়েটিং রুমটি খোলা ছিল, অন্যান্যবারের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি ওয়েটিং রুম বন্ধ থাকে, খুলিয়া দিতে বলিলে ষ্টেশন মাষ্টার বলে—তাইতো চাবিটা কোথায়! বিছানা ও বাক্স ওয়েটিং রুমের দরজার কাছে রাখিয়া ঘরে ঢুকিলাম। একটা পুরাতন টেবিলের উপরে বড় একটা কেরোসিনের ল্যাম্প, জ্বলিতেছে সন্দেহ নাই নতুবা এত ধোঁয়া উঠিবে কেন? পাশেই একখানা আরামচেয়ার। সেখানার উপরে বসিলাম। রেলওয়ে ওয়েটিং রুমের একটি বিশেষ গন্ধ আছে, বার্নিশ, ফিনাইল, ও বন্ধ আবহাওয়ায় মিলিয়া একটি বিচিত্র মিশ্র গন্ধ নাকে আসিল, বুঝিলাম বড় ষ্টেশনই হোক আর ছোট ষ্টেশনই হোক গন্ধটির বড় তারতম্য ঘটে না। ঠাণ্ডা আসিতেছিল, দরজা ভেজাইয়া দিলাম এবং গায়ের কাপড় বেশ টানিয়া লইয়া ঘুমাইবার আয়োজন করিলাম, সেই ভোর রাত্রে গাড়ী—খানিকটা ঘুমাইলে ক্ষতি নাই।

বোধকরি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, নতুবা স্বপ্ন দেখিলাম কি ভাবে, আবার না ঘুমাইলে জাগরণই বা কিভাবে সম্ভব? জ্যামিতির এক ডিগ্রি কোণে পিঠ থাকিলে জাগরণটাই স্বাভাবিক, ঘুমটাই

বিস্ময়কর। জাগিয়া দেখি ল্যাম্পটা বিসুভিয়াস পাহাড়ের মতো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, ঘরময় কেরোসিনের গন্ধ। উঠিয়া দরজা ফাঁক করিয়া দিলাম—কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকিল। আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। রাত্রি কত কে জানে, ষ্টেশনে কোন সাড়া শব্দ নাই, বোধকরি শেষ রাত্রের আগে উজানভাটির কোন গাড়ী নাই, তাই সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কেবল মাঝে মাঝে পাশের ঘর হইতে টেলিগ্রাফের টরে-টক্কার ইঙ্গিত স্মরণ করাইয়া দেয় আমরা বিচ্ছিন্ন নই, মানব সংসারের সহিত সংযুক্ত। চারিদিকে বিস্তৃত মাঠ, এখানে ওখানে পুঞ্জিত অন্ধকারে গাছপালার অস্তিত্ব—কিন্তু সেখানেও নিস্তব্ধতা, কেবল মাঝে মাঝে এক আধবার শিবাধ্বনি! শুধু আকাশের তারাগুলির কয়েকটা দরজার ফাঁক দিয়া দৃশ্যমান। হঠাৎ মনে হয় কাল-স্রোতের বাহিরে যেন কোন মহাশূন্যে আসিয়া পড়িয়াছি, কেমন একটা ভীত-বিস্ময়ের ভাব চাপিয়া ধরিতে চায়। সহসা ঘরের কোণে একটা শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখি আর একটা আরাম চেয়ারের উপরে একটি লোক সোজা হইয়া বসিয়াছে। ঘরে আর একখানা চেয়ার ছিল দেখিয়াছিলাম, কিন্তু লোকটিকে দেখি নাই, হয়তো ঘুমাইলে পরে আসিয়াছে, হয়তো ওখানেই ছিল, কেবল শুইয়াছিল তাই লক্ষ্য করি নাই, ল্যাম্পে আলোর চেয়ে ধোঁয়াই বেশী।

প্রথমে সেই লোকটাই কথা বলিল, সে বলিল, আমি গোড়া থেকেই আছি, আপনাকে অনেকক্ষণ থেকে দেখছি।

এবারে তাহাকে ভালো করিয়া লক্ষ্য করিলাম। অনেক দিন টব চাপা পড়িয়া থাকিলে ঘাসগুলো যেমন বিবর্ণ সাদা হইয়া যায়

তেমনি একপ্রকার শুভ্রতা তাহার মুখে, চোখ দুটাতে তীব্র জ্যোতি, তাহাও স্বাভাবিক নয়।

লোকটি বলিল—নাঃ, আর ঘুম হইবে না, তার চেয়ে একটু গল্প করা যাক। আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চেয়ারখানা টানিয়া কাছে আনিল। এবারে আরও ভালো করিয়া তাহাকে দেখিবার সুযোগ পাইলাম। শীর্ণ চেহারা অথচ রুগ্ন নয়, বিবর্ণ মুখে দীপ্ত চোখ। ও চোখ যেন ও মুখের নয়। লোকটির কণ্ঠস্বরেও একটা অস্বাভাবিকতা আছে, মানবকণ্ঠের মূর্ছনার যেন অভাব।

লোকটি দীপ্ত চোখ আমার উপরে স্থাপন করিয়া বলিল—কখনো ভূত দেখেছেন?

বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিল। আর দশ জন লোকের চেয়ে আমি যে বেশী ভীরু তা নয়, কিন্তু স্থান কাল পাত্রের বিনয় স্মরণ করিলে পাঠক আমার ভয়ের কারণ অনুমান করিতে পারিবেন।

আমি হঠাৎ উত্তর দিতে পারিলাম না, কি উত্তর দিব ভাবিতেছি, সে আবার শুধাইল—ভূতে বিশ্বাস করেন?

একবার ভাবিলাম, এই লোকটাই তো—তখনি মনে মনে হাসি পাইল, এ কি পাগলামি আমার মাথায় চাপিয়াছে। বুঝিলাম কিছু উত্তর দেওয়া উচিত, বলিলাম, না।

লোকটি বলিল—আমিও তাই অনুমান করেছিলাম। তারপরে বলিল—আমি দেখেছি।

ভাবিলাম, তবু ভালো যে তুমি নিজে ভূত নও।

তখন সে বলিল, গাড়ী আসতে তো দেরী আছে, সেই শেষ রাত্রে, আপনাকে ঘটনাটি বলি, শুনলে বুঝবেন ভূত অবশ্যই আছে।

মনে মনে ভাবিলাম—গভীর রাত্রে এ কি পাগলের হাতে পড়িলাম। বুঝিলাম, ভূত না থাকিলেও সংসারে পাগলের অভাব নাই। পাগলের হাতেই পড়িয়াছি। তবু শুনিতে আপত্তি কি সময় কাটিবে তো।

লোকটি আরম্ভ করিল—আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসতাম—

বিরক্ত হইয়া ভাবিলাম সেই চিরন্তন প্রেমের কাহিনী।

লোকটি আমার চিন্তার সূত্র ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—ভাবছেন যে একঘেয়ে প্রেমের কথা বল্‌তে যাচ্ছি! তা নয়, আগে শুনুন, তারপরে যা ভাববার ভাববেন।

আবার সে আরম্ভ করিল।

একটি মেয়েকে ভালোবাসতাম। প্রথম দৃষ্টিতেই যে তাকে ভালোবেসেছিলাম এমন নয়। অনেকদিনের পরিচয়ের শেষে ভালো-বাসার সেই দৃষ্টি এসেছিল। যেন হঠাৎ আলো জ্বলে উঠ্‌ল, এতদিন অন্ধকারে যেন পরস্পরকে দেখেছিলাম, সেদিন যেদিন ঐ আলো জ্বলে উঠ্‌ল, পরস্পরের মন বেশ স্পষ্টভাবে চোখে পড়লো, যেমন চোখে পড়ে ঝরণার নুড়িগুলো চাঁদের আলোয়।

এখানে একটু থামিয়া কি যেন মনে করিয়া লইল, আবার আরম্ভ করিল—হাঁ, সেদিন জ্যোৎস্না রাতই ছিল বটে, আমরা বেড়িয়ে ফিরছিলাম, সঙ্গীরা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল, চারদিক নিস্তব্ধ, নির্জ্জন তো বটেই, তালগাছের মসৃন পাতাগুলো জ্যোৎস্নায় যেন পেখম মেলে রাত্রির শোভা দেখে হঠাৎ মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, নাচতে ভুলে গিয়েছে, মাঠের উপরে জ্যোৎস্নার ফুল ছড়াচ্ছে, কালো দিগন্তের রেখাটাকে জ্যোৎস্নায় ধুয়ে ধুয়ে যেন

ক্ষীণ ক'রে ফেলেছে, আর দুই পোঁচ পড়লেই সেটা সম্পূর্ণ মুছে যাবে। হঠাৎ আমার মনে কি পরিবর্ত্তন ঘটে গেল, মনে হল এতদিন শুধু দীপ ছিল এবারে আলো জ্বলল। কি করছি ভাল করে বোঝবার আগেই তার হাত ধরে ফেলে বল্‌লাম, তোমাকে ভালবাসি। সে হাত ছাড়াতে চাইলো না, আগে হ'লে চাইতো, এমন কতবার ছাড়িয়েছে। সে কোন উত্তর দিল না। তার চোখের দিকে তাকালাম, স্তিমিত চোখ দুটিতে যেন দুটি শিউলির কঁ‍ুড়ি ফুটে উঠ্‌বার চেষ্টা করছে; তাদের উপরে ভোরের আলো পড়েনি অথচ ভোরের শিশিরের ছোঁয়াচ লেগেছে। ঠোঁটের উপরে একটু-খানি স্বচ্ছতার মতো, সে কি জ্যোৎস্নার আভাস না হাসির আভা আজো বুঝতে পারিনি। মরীচিকা যেমন কাঁপে অথচ চলে না তেমনি এক রকম চঞ্চলতা তার সারা অঙ্গে। তার সেই নীরবতায় আমার কথার জবাব পেলাম। কথায় এর চেয়ে বেশী স্পষ্ট ক'রে আর কি বলা যেতো!

লোকটি বলিয়া যাইতেছে, মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে, কিন্তু উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে না, যেন সে প্রশ্ন নিজেরই কাছে, কাহিনীটা যেন নিজেকেই বলিতেছে, সমস্তই যেন সুদীর্ঘ এক স্বগতোক্তি। আমার একবার মনে হইল, সে বোধ করি আমার অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু মাঝে মাঝে উজ্জ্বল চোখ দুটি আমার উপর পড়িয়া স্মরণ করাইয়া দেয় যে আমাকে ভোলে নাই।

লোকটি বলিতেছে—দুজ'নে দু'জনের মনের ভাব বুঝলাম। এবারে বিয়ের কথা মনে উদয় হ'ল। যারা মনে করে দু'জন স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে ভালোবাসে আর বিয়ের কথা মনে করে না—

তারা কিছুই জানে না। যে-প্রণয়ীযুগলের বাস্তবে বিয়ে হ'তে পারলো না, তারা কল্পনায় হাজার বার বিয়ে করে। এতেই বোঝা যায়, বিবাহটা সামাজিক সংস্কারমাত্র নয়, প্রেমের অবস্থাভেদ।

আমি এবার বাধা দিলাম, বলিলাম, যা বলেছেন সবই ঠিক, কিন্তু ভূত কোথায়?

সে ব্যস্তমাত্র হইল না, বলিল, আসছে অপেক্ষা করুন।

অপেক্ষা তো করিয়াই আছি।

সে বলিল—কিন্তু বিয়ে আমাদের হবার উপায় ছিল না,- দুজনের বাড়ী থেকেই আপত্তি উঠল। আমি পুরুষ মানুষ, আমার শক্ত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কাপুরুষ আমি—

অনেকক্ষণ আর কথা বলিতে পারিল না, দুই হাতে মাথা ধরিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

সে বলিতে লাগিল—দু'দশ দিন পরেই বুঝ্লাম বিয়ে হবার নয়। অন্যত্র আমার বিয়ের কথা হ'তে লাগলো, নমিতা, হাঁ, ঐ তার নাম ছিল—অসুস্থ হ'য়ে পড়লো। পাশের গ্রামেই তাদের বাড়ী; খবর শুনলাম তার ক্রমেই অসুখ বাড়ছে, কিন্তু দেখা হ'বার আর কোন উপায় ছিল না. কোন্ মুখে দেখা করতে যাই।

এবারে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি বোধ হয় বিরক্ত হ'য়ে উঠেছেন—ভালো—আমি খুব সংক্ষেপে সারবো। অন্যত্র আমার বিয়ে স্থির হ'য়ে গেল। আত্মীয়েরা বল্ল, মেয়ে দেখবে? আমি অস্বীকার করলাম। একখানা ছবি তারা দিল। মেয়েটা সুন্দরী বটে। তারপরে একদিন বিয়ে করতে চললাম, যাবার আগে শুনে গেলাম নমিতার অসুখ বেড়েছে।

বিয়ের অনুষ্ঠান আরম্ভ হ'ল। শুভদৃষ্টির সময়ে দু'জনের মাথার উপর দিয়ে চাদর ফেলে দিল—ঠিক সেই সময়ে বিবাহ সভায় গ্যাসের আলো ক'টা গেল নিভে। কন্যাপক্ষের একজন বধূর মুখের ঘোমটা সরিয়ে দিল—আমি তাকালাম। কি এ কি? কি দেখলাম? এ কার মুখ? এ যে নমিতার মুখ? শীর্ণ পাণ্ডুর —কিন্তু ঠিক সেই মুখ! মনে হ'ল আমার চোখ ভুল দেখেছে। আর একবার দেখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলাম। নতুন বধূকে ভালো ক'রে দেখবার আগ্রহ প্রকাশে বন্ধুরা হাসাহাসি করলো—কিন্তু আর একবার না দেখে ছাড়লাম না। সেই মুখ। মুদ্রিতচক্ষু বধূর মুখে রুগ্ন নমিতার ছায়া। ভুল হ'তেই পারে না। ফটোগ্রাফে বধূর যে মুখ দেখেছিলাম—এ মুখের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। আমার মাথা ঘুরতে লাগলো, শরীর কাঁপতে লাগলো, শীতের রাত্রে কপালে ঘাম দেখা দিল! ভাবতে লাগলাম—এ কি দেখলাম। কিন্তু এ সব কথা তো কাউকে বলা যায় না—চুপ ক'রে থাকলাম।

তারপরে দু'জনে বাসরঘরে এসে বসলাম। হঠাৎ নূতন বধূ অসুস্থ বোধ ক'রে শুয়ে পড়লো—তার ফিট হ'লো, ক্রমে সে সংজ্ঞাহীন হ'য়ে পড়লো, ডাক্তার এলো—কিন্তু সে আর সংজ্ঞা ফিরে পেল না। শেষ রাত্রে সে গতপ্রাণ হ'ল। এবার ভালো ক'রে তার মুখ দেখতে পেলাম। সেই মুখের ছায়া তার মুখমণ্ডলে। তার আত্মীয়স্বজনেরা অবধি বলাবলি ক'রতে লাগলো কমলার চেহারা যেন কেমন হ'য়ে গেছে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে আবার থামিল। কিছুক্ষণ পরে একটা

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—তারপরে আর কি! সকালবেলা একাকী ফিরে গেলাম। ফিরবার পথে ভাবলাম একবার নমিতার খবর নিয়ে যাই। তাদের গ্রামে ঢুকতে গিয়েই সংবাদ পেলাম নমিতার মৃত্যু হ'য়েছে, ঠিক যে-সময় কমলার মৃত্যু হ'য়েছিল সেই সময়েই নমিতা মারা গিয়েছে। তখন মনে হ'ল—শুভদৃষ্টির দেখা আমার চোখের ভুলমাত্র নয়, নমিতা আমাকে দেখা দিতেই গিয়েছিল।

তারপর থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোথাও টি'কতে পারি না, কে যেন তাড়া ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

তারপরে শুধালো—এবারে ভূতে বিশ্বাস হ'ল কি?

কি উত্তর দিব ভাবিতেছি এমন সময়ে আলোটা বারকয়েক দপ্‌দপ্‌ করিয়া হঠাৎ নিভিয়া গেল। সেই নির্জ্জন অন্ধকার কক্ষে তার কাহিনীটা বাস্তব বলিয়া মনে হইতে শুরু করিল। এমন সময়ে সে চীৎকার করিয়া উঠিল—ঐ যে, ঐ যে—বলিয়াই দরজা দিয়া সবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম সে আর ফিরিল না। মূঢ়ের মতো বসিয়া রহিলাম। হঠাৎ মনে হইল ঘরটা অত্যন্ত বেশী ঠাণ্ডা, শরীরের ভিতরকার হাড়গুলি অবধি কাঁপিতে লাগিল। এমন সময়ে দরজার দিকে তাকাইতেই মনে হইল, সাদা কাপড় পরিয়া কে যেন দণ্ডায়মান! মাথা খারাপ হইল নাকি ভাবিয়া আর একবার তাকাইলাম—না, দরজার ফাঁক দিয়া ভোরের আবছা আলো দৃশ্যমান, সাদা কাপড়ও নয়, মানুষও নয়। তবু শরীরের মজ্জার কাঁপুনি থামিল না।

যথাসময়ে গাড়ী আসিল, আমি রওনা হইয়া চলিয়া আসিলাম।

আর দিনের আলো হইবামাত্র লোকটির কাহিনীকে পাগলামি বলিয়া মনে হইল, ভাবিলাম, আচ্ছা পাগলের হাতে পড়িয়াছিলাম! কিন্তু কখনো অন্ধকার রাত্রে নির্জন ঘরে বসিয়া ঘটনাটি মনে পড়িলে তেমন অবাস্তব বোধ হয় না, মনে হয় কিছু থাকিলেও থাকিতে পারে—জীবনের সব রহস্য মানুষের সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত এমন কখনই হইতে পারে না।

দ্বিতীয় পক্ষ

দেখ, ওঠ, ওঠ—নূতন বধূ নীলিমা শেষ রাত্রে স্বামীকে ঠেলা মারিয়া জাগাইয়া দিল। অন্নদাপ্রসাদ ধড় ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল, শুধাইল—কি হ'য়েছে নীলি?

নীলিমা বলিল—আমার কেমন ভয় করছে।

অন্নদা সান্ত্বনার ও জিজ্ঞাসার সুর মিশাইয়া বলিল—ভয় কিসের?

—বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

—কি বল তো?

বধূ বলিতে লাগিল—যেন কে আমার শিয়রের কাছে বসে ছিল; ঘুম ভেঙে গেল; আবার ঘুমালাম—আবার তাকে দেখলাম, লালশাড়ী-পরা, গায়ে ফুলের গহনা, যেন সে-ও এক নূতন বউ!

অন্নদা পরিহাস করিয়া বলিল—ওঃ তাহলে নিজেকেই দেখেছ?

বধূ বলিল—না, তার মুখে যেন কত দুঃখের চিহ্ন, এমন বিষণ্ণ চোখ আমি দেখিনি।

এক মুহূর্তের জন্য অন্নদাপ্রসাদের মুখ কালো হইয়া গেল, কিন্তু প্রদীপের স্তিমিত আলোতে তাহা নীলিমার চোখে পড়িল না।

স্বামী বলিল—কিছু ভয় নেই লক্ষ্মীটি, আমি আছি, ঘুমোও। ভীত নীলিমা স্বামীর বুকের কাছে আশ্রয় লইয়া শুইয়া পড়িল।

দিনের বেলায় এ-বিষয়ে আর কেহ কোন কথা তুলিল না, বাড়ীতে গোটা-দুই চাকর ছাড়া তৃতীয় আত্মীয়স্বজন কেহ না থাকাতে স্বভাবতই এ-বিষয়ে কাহাকেও বলিবার সুযোগ নীলিমার ছিল না।

কিন্তু রাত্রিতে আবার নীলিমা জাগিয়া উঠিয়া স্বামীকে জাগাইয়া দিল—ওগো শুন্‌ছ, ওঠ, ওঠ।

—আবার কি হ'ল? অন্নদাপ্রসাদ জাগিয়া উঠিল।

—সেই স্বপ্ন আবার দেখেছি।

—কি, বল দেখি। অন্নদাপ্রসাদ আগের রাতের ঘটনা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিল।

বধূ বলিল লাল শাড়ী আর ফুলের গহনা-পরা কে একজন যেন আমার শিয়রের কাছে—

নীলিমার মুখের অর্ধসমাপ্ত বাক্যকে পূরণ করিয়া অন্নদাপ্রসাদ বলিল—চুপ ক'রে বসে ছিল। এই তো—তা থাকুক না।

নীলিমা বলিল—না, আজ সে কথা ব'লেছে।

—কথা? অন্নদা চমকিয়া উঠিল।—কি কথা?

—সে বলছিল আমাকে ঠেলা মেরে, 'তোর যায়গায় যা, এখানে কেন?'

অন্নদাপ্রসাদ এবারে সত্যই চমকিয়া উঠিল। এমন সময়ে ঘরের প্রদীপ নিবিয়া গেল—অজ্ঞাতসারে তাহারা পরস্পরের কাছে সরিয়া আসিল; আর সেই শীতের রাত্রেও দু-জনের কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমিতে লাগিল—অন্ধকার বলিয়া কেহ দেখিতে পাইল না।

স্বামী শুষ্ক কণ্ঠে বলিল—ও কিছু না। অমন হ'য়ে থাকে।

—কেন হয় বল না?

অন্নদা আর কিছু বলিবার পাইল না, তাই বলিল—আচ্ছা কাল বুঝিয়ে দেব। সে শুইয়া পড়িল—বধূ তাহার কোল ঘেঁসিয়া শুইল।

প্রবীণ পাঠক বোধ হয় এতক্ষণে অনুমান করিতে পারিয়াছেন

অশরীরী

যে নীলিমা অন্নদাপ্রসাদের দ্বিতীয় পক্ষের বধূ। প্রথম পক্ষের বধূ শ্রীলেখা তিন বছর ঘর করিবার পরে কয়েক মাস আগে মারা গিয়াছে। অন্নদার পুনরায় বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু না করিবারও কোন কারণ ছিল না; তাহার বয়স সবে সাতাশ; সন্তানাদি নাই, প্রচুর টাকা কড়ি আছে। শেষে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সে নীলিমাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। কন্যাপক্ষ অনুমান করিতে পারে নাই যে অন্নদার দ্বিতীয় পক্ষ; কেমন করিয়া পারিবে! সাতাশ বছর বয়স বিবাহের পক্ষে বেশী নয়—আজকাল-কার বিচারে কিছু কমও হইতে পারে। কথা যখন উঠিল না অন্নদাও চাপিয়া গেল; শুধু তাই নয়, পাছে দ্বিতীয় পক্ষ জানিয়া নীলিমা ব্যথা পায়, তাই সে বিবাহের পরে দেশে না ফিরিয়া পশ্চিমের এক শহরে চলিয়া গেল; আর শ্রীলেখার চিহ্ন যতদূর সম্ভব মুছিয়া ফেলিল; চিঠিপত্রগুলি ছিঁড়িল; ফোটোগুলি পুড়াইল; তাহার ব্যবহৃত শাড়ী জামা গরীবদের বিলাইয়া দিল। সে ভাবিয়াছিল কখন হয়ত কথায় কথায় নীলিমাকে শ্রীলেখার কথা বলিবে—কিন্তু এই ঘটনার পরে তাহা আর সম্ভব বলিয়া মনে হইল না।

সেদিন দুপুরবেলা অন্নদা রোদে বসিয়া একখানা উপন্যাস পড়িতেছিল আর নীলিমা প্রকাণ্ড একটা তোরঙ্গ খুলিয়া কাপড় চোপড় রোদে দিবার ব্যবস্থা করিতেছিল। নীলিমা কতকগুলি শাড়ী ও ব্লাউজ বাহির করিতে করিতে বলিল—দেখ, অন্য কোন দিকে তোমার দৃষ্টি নেই, কিন্তু বিয়ের আগেই এতগুলো শাড়ী কিনতে গেলে কেন?

অন্নদা হাসিয়া বলিল—কবে যুদ্ধ বেধে যায়—তখন তো আবার চড়া দামে কিনতে হ'ত!

—কিন্তু ব্লাউজ যে এতগুলো করিয়ে রেখেছ বোকার মতো, যদি আমার গায়ে ছোট হ'ত, কি বড় হ'ত!

অন্নদা পুনরায় হাসির চেষ্টা করিয়া বলিল—কিন্তু ছোটও হয়নি, বড়ও হয়নি, ঠিকই হ'য়েছে তো!

—তা হ'য়েছে বটে! নীলিমা ভাজ খুলিয়া একে একে বস্ত্রাদি রোদে দিতে লাগিল।

না হইবারই কথা। শ্রীলেখা আর নীলিমা দুজনে প্রায় এক মাপেরই। এ সমস্তই শ্রীলেখার; তবে তাহাতে ব্যবহারের কোন চিহ্ন নাই বলিয়া, আর দামও অনেক, অন্নদা সেগুলি পরিত্যাগ করে নাই।

নীলিমা কৌতূহল ও আব্দারের সুরে শুধাইল—আচ্ছা কি ক'রে তুমি আমার ঠিক মাপটি জানলে?

অন্নদা বলিয়া ফেলিল—তা জান না? বিয়ের আগে তোমাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম—

কিন্তু কথাটা হঠাৎ-দেখা সাপের মতো দু-জনকেই চমকাইয়া দিল; স্বামী অস্বস্তি বোধ করিল, বধূর রাত্রের স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়া গেল।

সে বলিল—আচ্ছা এই যে আমি রাতের পর রাত ঐ একই স্বপ্ন দেখে যাচ্ছি, এর কোন প্রতিকার করবে না?

অন্নদা বলিল—স্বপ্নের আর প্রতিকার কি? আর তোমার কিছু ক্ষতিও তো হচ্ছে না।

নীলিমা বলিল—আমার কি মনে হয় জান—অন্নদার বুক কাঁপিয়া উঠিল—মনে হয় এ বাড়িতে কোন প্রেত বাস করে; সে চায় না যে আমি এখানে থাকি, তাই ক্রমাগত বলে, এখানে কেন? তোর জায়গায় যা! তারপরে একটু থামিয়া বলিল—আচ্ছা বাসাটা বদলালে হয় না!

অন্নদা কথাটাকে চাপা দিবার জন্য বলিল—আচ্ছা দেখা যাবে।

অবস্থা ক্রমে অধিকতর সঙ্কটজনক হইতে লাগিল। নীলিমার ঘুমাইবার উপায় আর রহিল না। একটু ঘুম আসিয়াছে কি, অমনি সে ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে—ওগো, শুনছ, আবার সেই মূর্তি! অন্নদা কতক্ষণ জাগিয়া থাকিবে? অল্পক্ষণ পরেই সে [illegible] ড—নীলিমা স্থির করে, সে আর ঘুমাইবে না, বাকী রাতটুকু জাগিয়া কাটাইবে;—কিন্তু ক্রমে জাগরণও অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

নির্জন ঘর, নিসঙ্গ প্রহর; স্তিমিত দীপের আলোয় দেয়ালে কিম্ভূত সব ছায়া পড়ে; চোখ বন্ধ করিলে সেই শাড়ী-পরা মেয়েটাকে মনে পড়িয়া যায়; চোখ খুলিয়া থাকিলে দেয়ালের চটা-ওঠা রেখাগুলা ক্রমে রক্তে মাংসে পুরিয়া সজীব হইয়া উঠিতে থাকে!

দক্ষিণ দিকের দেয়ালে ওটা তো ছায়া! কিন্তু নড়িতেছে কেন? না, নড়িবে কেন? কি আশ্চর্য, এমন ভাবে দেয়ালের চটা উঠিয়াছে,

ঠিক একটা মেয়েমানুষের চেহারা সৃষ্টি করিয়াছে! শাড়ীটা যেন লাল!

নড়িতেছে নাকি! স্বপ্নে দেখা সেই মানুষ!

নীলিমা চমকিয়া উঠিয়া স্বামীকে জড়াইয়া ধরে—অন্নদাপ্রসাদ লাফ দিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করে—কি, আবার স্বপ্ন দেখলে নাকি?

নীলিমা বলে— আমি তো ঘুমোইনি।

—তবে?

—সে যেন এসেছিল।

—কে?

নীলিমা ভয়ে ভয়ে বলে, পাছে যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা, সে শুনিতে পায়—স্বপ্নে-দেখা সেই মেয়েটা।

এমন সময় হয়ত প্রদীপটা নিবিয়া যায়, দুইজনে অন্ধকারে বসিয়া ঘামিতে থাকে। নীলিমা বলে—চল বাসা বদলাই। অন্নদা শুষ্ক কণ্ঠে বলে—আচ্ছা।

অবশেষে বাসা বদলানোই স্থির হইল। অনেক খুঁজিয়া মনের মতো একটা বাসা মিলিল, আগামী কাল সেখানে উঠিয়া যাওয়া হইবে। নীলিমার মন অনেক হাল্কা হইয়া গেল, বহুদিন পরে তার মুখে হাসি দেখা দিল। সারা দিন সে খাটিয়া জিনিষ পত্র গুছাইল, বাঁধা-ছাঁদা করিল, কাল সকাল বেলাতেই যাহাতে বাসা ছাড়িতে কোন অসুবিধা না হয় তাহার সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিল—এমন কি অন্য দিন সন্ধ্যাবেলা আসন্ন শয্যার কথা মনে পড়িয়া যে আতঙ্ক উপস্থিত হইত, সে-ভাবটাও কমিয়া গেল; বিছানায় শুইতেই তাহার ঘুম আসিল। অন্নদা তাহার পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

অশরীরী

আজ শেষ রাত্রি। নীলিমা স্বপ্ন দেখিল, সেই মেয়েটি লাল শাড়ীতে ফুলের গহনায় সাজিয়া আসিয়া তাহার পাশে বসিল।

নীলিমা বলিল—তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেছি—আমাকে আর বিরক্ত করিও না।

সেই মেয়েটি বলিল—বাসা ছাড়িলেই কি আমাকে ছাড়িতে পারিবে?

—নয় কেন?

—আমার জায়গা যে অধিকার করিয়া বসিয়াছ!

নীলিমা শুধাইল—তোমার জায়গা। সে আবার কি?

মেয়েটি বলিল—যদি জানিতে চাও, ওঠ।

স্বপ্ন-চালিত নীলিমা উঠিল।

সেই মেয়েটি বলিল—বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে চল।

নীলিমা যন্ত্রের মতো বাহিরে আসিল, শুধাইল কোথায় যাইতে হইবে?

—আমার পিছনে পিছনে এসো।

তাহাকে অনুসরণ করিয়া নীলিমা চলিল। সে ঘর ত্যাগ করিল; আর একটা ঘরও ছাড়িয়া আসিল; তারপরের ঘরে মেয়েটি থামিল—নীলিমা থামিল।

মেয়েটি বলিল—ওই টেবিলের ছোট দেরাজে একটা চাবি আছে, খোলো।

নীলিমা দেরাজ খুলিয়া চাবি লইল। এখন এই ঘরটাতে তাহাদের তোরঙ্গ, বাক্স প্রভৃতি থাকিত।

মেয়েটি বলিল—ঐ হাতবাক্সটা খোলো।

নীলিমা বলিল—ও হাতবাক্স আমার স্বামীর, আমি কখনও খুলি না।

মেয়েটি বলিল—যদি সব জানতে চাও তবে খোল।

নীলিমা যন্ত্রের মত খুলিয়া ফেলিল।

—ঐ ডালাখানা তোল।

নীলিমা তাহাই করিল।

—এইবারে ঐ কাগজগুলা সরাও।

নীলিমা সরাইল।

—ঐ দেখ একখানা বড় খাম। ওখানা বাহির করিয়া লও।

নীলিমা বাহির করিল।

—এবার বাক্স বন্ধ করিয়া চাবি যথাস্থানে রাখ।

নীলিমা সেইরূপ করিল।

তখন মেয়েটি বলিল—এইবারে দেখ খামখানার ভিতরে কি আছে।

নীলিমা একখানা পুরু কাগজ বাহির করিয়া ফেলিল।

মেয়েটি বলিল—ও খানাতে কি আছে দেখ।

এইখানে নীলিমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে দেখিল তাহার হাতে একখানা ছবি—রক্তাম্বরা, ফুলসজ্জায় সজ্জিতা, বধূবেশিনী সেই স্বপ্নে-দেখা মেয়েটির ফটোগ্রাফ। এক মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই চীৎকার করিয়া উঠিয়া মূর্ছিত হইয়া সশব্দে মেঝের উপরে পড়িয়া গেল।

সেই শব্দে অন্নদাপ্রসাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; দেখিল পাশে নীলিমা নাই; নানারূপ শঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। কোথায় গেল সে? নাম ধরিয়া ডাকিল—কেহ উত্তর দিল না।

তখন মনে হইল—এই মাত্র একটা শব্দ শুনিল—কিসের শব্দ? সে আলো লইয়া এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিল বাক্স রাখিবার ঘরের মেঝেতে নীলিমা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। অন্নদাপ্রসাদের মুখে কথা বাহির হইল না। কিন্তু এমন করিয়া থাকিলে তো চলিবে না। সে জল আনিয়া তাহার মাথায় দিল—পাখা লইয়া বাতাস করিল, নাম ধরিয়া ডাকিল; অনেক চেষ্টার পরে নীলিমার মূর্চ্ছা ভাঙিল, জ্ঞান ফিরিল।

সে শুধাইল—তুমি কে?

অন্নদা বলিল—আমি অন্নদা।

নীলিমা শুধু বলিল—ও।

অন্নদা শুধাইল—তুমি এখানে এলে কি করে?

সে বলিল—সেই মেয়েটি নিয়ে এসেছে।

—কোন মেয়েটি?

—সেই যাকে স্বপ্নে দেখেছি।

অন্নদা বলিল—ও সব বাজে! তুমি স্বপ্ন দেখে এখানে চলে এসেছ।

নীলিমা দৃঢ়ভাবে বলিল—স্বপ্ন নয়! তারপরে নিজকেই যেন প্রশ্ন করিল—ছবিখানা কোথায়?

অন্নদা বলিল—ছবি! কিসের ছবি?

নীলিমা বলিল—সেই মেয়েটির—সেই এক মুখ, এক সাজ!

সে এদিক-ওদিক তাকাইতে তাকাইতে দেখিতে পাইল অদূরে ছবিখানা পড়িয়া আছে, মূর্ছিত হইয়া পড়িবার সময়ে হাত হইতে ছিটকাইয়া গিয়াছিল। সে ছবিখানা তুলিয়া লইয়া বলিল—এই মেয়েটিকেই আমি প্রতিরাত্রে স্বপ্নে দেখি। আজ সে আমাকে

বলেছিল, এ বাসা ছাড়লেই আমাকে ছাড়তে পারবে না। তখন সে আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসে তোমার হাতবাক্স থেকে এই ছবি বা'র করতে বাধ্য করল। তারপরে বলল—এবারে দেখ। তখন আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি যাকে এতদিন স্বপ্নে দেখেছি—এ ছবি তারই।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে অন্নদাকে জিজ্ঞাসা করিল—ঐ ছবি তোমার বাক্সে এল কি ক'রে ?

অন্নদা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপিয়া বলিল—বিছানায় চল, সব বলব !

বিছানায় গিয়া অন্নদাপ্রসাদ সব স্বীকার করিল। প্রথম পক্ষের পত্নীর কথা শুনিয়া নীলিমা দুঃখিত হইল না, বরঞ্চ সে স্মৃতি যাহাতে নীলিমাকে ব্যথিত না করে সে জন্য কত সঙ্কোচে অন্নদা সব দিক বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছে জানিয়া স্বামীর প্রতি ভক্তি তাহার বাড়িল।

অন্নদা বলিল—আমি শ্রীলেখার সব স্মৃতি মুছে ফেলেছিলাম, কেবল ঐ ফুলসজ্জার সাজে তোলা ফোটোগ্রাফখানা নষ্ট করিনি। কিন্তু আমার বিস্ময় লাগে তুমি তার খোঁজ জানলে কি ক'রে ?

নীলিমা বলে,—সে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে। নইলে আমি কি জানতাম ওটা ওখানে আছে ?

অন্নদা বলে—সে কথা ঠিক। শুনেছি সোম্‌নাবুলিজমে এমন হয়।

পরদিন তাহারা সে বাসা ছাড়িয়া গেল। তাহাদের পরবর্ত্তী কালের ইতিহাস আর জানি না।

সমাপ্ত